Vol. 29 | No. 2 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সোমেন চন্দের জীবন ও প্রসঙ্গ-কথা

Volume	29
Issue	2
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	February 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i2.6
Pages	165-221
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সোমেন চন্দের জীবন ও প্রসঙ্গ-কথা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

রেভল্যুশনের সময় আমি ভ্যানগার্ডে থাকতে চাই

সাহিত্য-শিল্প দ্বন্দ্বমুখর সমাজসত্তা-ভাবনা এবং সমষ্টি-অস্তিত্বের প্রয়োজন-বোধ থেকে কোন-সূত্রেই মুক্ত নয়; কিংবা নয় দেশ-কাল নিরপেক্ষ স্বয়ম্ভূ কোন অলৌকিক সৃষ্টি। মহৎ শিল্পী-চৈতন্য বস্তুজগৎ-নিরপেক্ষ কিংবা দেশ-কাল বিবিক্ত হতে পারেনা; শিল্পীর জীবনভাবনা এবং শিল্পচেতনা অনিবার্যভাবে সমকালের দ্বান্দ্বিক ও বিবর্তন-চঞ্চল সমাজসত্তায় লালিত-বর্ধিত। সামাজিক জীবনের অঙ্গীকারে এবং অস্তিত্বের প্রয়োজনেই সাহিত্য-শিল্প প্রাণিত হয়ে উঠতে পারে এবং এভাবেই তা অতিক্রম করে যায় স্বকালের সীমানা। সমাজচৈতন্য ও ব্যক্তি-সংবেদনার অন্তর্মূল মিথস্ক্রিয়ায় নির্মিত হয় যে সাহিত্য, তার মৌল-উপজীব্য মানবিক জাগর-চৈতন্যের অভীপ্সাময় এক অস্তিত্বের উপলব্ধি আর সমাজ-প্রগতি। সামাজিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যখন স্রষ্টার নান্দনিক-বোধ সমন্বিত হয়ে যায়, তখনই ঘটে বিশেষ কোন সাহিত্য-কর্মের শৈল্পিক সিদ্ধি আর কালোত্তীর্ণ ঋদ্ধি।

উত্তর-সামরিক বিশ্ব-বিপর্যয়ের এলিয়টীয়-পটে তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে যখন নেতি আর 'নিখিল নাস্তি'র বহ্নুৎসব, তখন সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে উপর্যুক্ত প্রগতিশীল বস্তুনিষ্ঠ ধারণা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সোমেন চন্দের[1] আবির্ভাব। বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, বরং বাংলা ভাষায় গণ-সাহিত্যের ধারা নির্মাণই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট ও অভীপ্সা। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে সোমেন চন্দ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে (১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১০ই জ্যৈষ্ঠ) জন্মগ্রহণ করেন। সোমেনের পিতার নাম নরেন্দ্রকুমার চন্দ আর মাতা সরযূ চন্দ। সোমেনেরা দুই ভাই, দুই বোন।[2] সোমেনের পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার নরসিংদি মহকুমার (বর্তমানে জেলা)

অন্তর্গত ষোড়াশালের নিকটবর্তী বালিয়া গ্রামে। তবে সোমেন জন্ম-গ্রহণ করেন তাঁর মামাবাড়ি বিক্রমপুরে। বিক্রমপুরের গর্বিত মাটি আর জল-হাওয়ায় সোমেন চন্দ বড় হয়ে ওঠেন এবং সেখানেই চলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে বন্ধুদের সাথে তিনি ঘুরে কাটিয়েছেন শৈশব-কৈশোরের স্বপ্ন-রঙিন দিনগুলো। গ্রামীণ মানুষের আর্থিক বিপর্যয় দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন, তখন থেকেই তাঁর রোমাণ্টিক মনে সাধারণ মানুষের অবস্থা-পরিবর্তনের ভাবনা জেগেছে। বিক্রমপুর ছেড়ে সোমেন যখন ঢাকায় বাস করছেন, তখনো মাঝে মাঝে তিনি যেতেন বালিয়া কিংবা বিক্রমপুরের গ্রামে—কখনো মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, কখনো-বা গল্প লেখার অনুপ্রেরণা আর উৎস-সন্ধানে। তিরিশের দশকের 'বালিগঞ্জ' (১৩৪৬/১৯৩৯), 'অগ্রগতি' (১৩৪৫/১৯৩৮), 'সবুজ বাংলার কথা' (১৩৪৫/১৯৩৮) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক নির্মলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে সোমেন চন্দের বিক্রমপুর-জীবনের এক-টুকরো দীপ্র ইঙ্গিত :

> রোমানফের লেখা একটি গল্পগুচ্ছ সোমেন্দ্র তখন পড়ছিল। বল্‌লো, 'এই ধরনের গল্পের উপাদান অমি ঢাকা বিক্রমপুর থেকেই আপনাকে হাজার হাজার দিতে পারি।[৩]

নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান সোমেন চন্দ ছোটবেলা থেকেই প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন; অভাব-অনটন-অপূর্ণতা ছিল তাঁদের পরিবারের নৈমিত্তিক বিষয়। সোমেনের পিতা নরেন্দ্রকুমার ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, তাই সংসারের দিকে তিনি নজর দিতেন না তেমন। যৌবনে তিনি স্বদেশচিন্তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সচেতনভাবে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। নরেন্দ্রকুমারের মনে তখন আশার সোনালি-রূপালি স্বপ্ন, স্বদেশপ্রেমের আলোয় তার চিত্তলোক উদ্ভাসিত। তাই কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি যে চাকুরি পেলেন, সেখানে দুর্নীতির সন্ধান পেয়ে চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অকুণ্ঠিত-চিত্তে। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রকুমার ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের স্টোর্স বিভাগে স্বল্প-বেতনের চাকুরীতে যোগ দেন। যা বেতন পেতেন, তাতে সংসার চালাতে তাকে খুব কষ্ট করতে হতো; তবু নরেন্দ্রকুমার সর্বদাই ছিলেন প্রাণোচ্ছল আর হাসি-খুশীতে ভরপুর। অভাবের সঙ্গে সংগ্রামরত

নরেন্দ্রকুমার পুত্র সোমেনকে খুব ভালোবাসতেন, সোমেনের সব আকাঙক্ষাই তিনি মিটাতে চেষ্টা করতেন। সোমেন যখন ঢাকার পগোজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র (১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ), তখন পিতার কাছে একটা বাই-সাইকেল কিনে দেয়ার জন্যে বায়না ধরেন। পুত্রের প্রতি স্নেহবশত নরেন্দ্রকুমার অতি কষ্টে সোমেনকে একটা বাই-সাইকেল কিনে দেন। এই সময় থেকেই সোমেনের নিত্য-সহচর ছিল বাই-সাইকেল আর বিভিন্ন ধরনের বই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সোমেন পিতার দেয়া এই বাই-সাইকেলে করেই ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

অতি অল্প বয়সেই সোমেন পিতার কাছ থেকে গল্পচছলে বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, বালগঙ্গাধর তিলক, ক্ষুদিরাম দাস, লালা লাজপৎ রায়, ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীর নাম শুনেছেন। এ-ভাবে শৈশব থেকেই এক ভাবী বিপ্লবীর চিত্তে দোলা দিয়েছে দেশপ্রেমের উর্মি আর কল্লোল। অল্প বয়সেই সোমেন চন্দ স্বদেশীসমাজ সম্পর্কে হয়ে ওঠেন সচেতন। বিপ্লবীদের গল্প বলতে নরেন্দ্রকুমারের যেমন কোন ক্লান্তি ছিলনা, তেমনি তা শুনতে সোমেন ছিলেন পরম আগ্রহী। ফলে পিতা-পুত্রের রাজনৈতিক আড্ডা জমতো ভালো; সোমেন প্রায়শই পিতার অগোচরে বিপ্লবীদের অনেক কথা তাঁর নোট বই-এ টুকে রাখতেন। শুধু স্বদেশই নয়, নরেন্দ্রকুমার সোমেনের কাছে বিদেশের রাষ্ট্রনায়ক ও ও রাজনীতি সম্পর্কেও অনেক গল্প করতেন। সোমেন অত্যন্ত অল্প বয়সেই র‍্যাম জে, ম্যাকডোলান্ড, উইন্স্টন চার্চিল, লয়েড জর্জ, ভ. ই. লেনিন প্রমুখ রাজনীতিবিদের নাম পিতার কাছ থেকে জেনেছেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা (১৯১৪-১৯১৭), জার্মানীর পরাজয়, লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা (১৯১৭)—সমসাময়িক পৃথিবীর এসব ঘটনা তিনি পিতার মুখেই শুনেছেন। এভাবে, স্বদেশপ্রেম আর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মন্ত্র, সোমেন চন্দ পিতার কাছ থেকেই প্রথম পেয়েছেন।

ছেলেবেলায় সোমেন ছিলেন দুরন্ত, জেদী আর ভীষণ অভিমানী এক কিশোর। তাঁর যত্নে কোন ত্রুটি হলে কিংবা কখনো আদরের এতটুকু প্রকাশ না থাকলে অভিমানী এই কিশোর ঠাকুর মা, মা, বাবাসহ বাড়ির সকলকে তটস্থ করে রাখতেন। কখনো রাগ করলে, সহসা তাঁর রাগ

ভাঙতো না। রাগের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা না খেয়ে শুয়ে থাকা ছিল তাঁর প্রিয় অভ্যাস। কিশোর বয়সেই গল্পের প্রতি ছিল সোমেনের তীব্র আকর্ষণ। মা-ঠাকুরমা-দিদিমা হয়তো এতদিনে বুঝে ফেলেছেন অভিমানী এই কিশোরের মনের কথা। তাই রাগ ভাঙানোর জন্যে তারা বিছানার কাছে গিয়ে শুরু করতেন হয়তো কোন এক রাজকুমার আর রাজকুমারীর দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প, নয়তো অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগের এক রাজ্যে ভূত আর রাক্ষসের এক অদ্ভুত গল্পকথা। একটু পড়েই সোমেনের মুখে হাসি ফুটতো; গল্প হঠাৎ থেকে গেলে বলে উঠতো, 'তারপর কি হলো ঠাকুরমা?' বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেনের রাগ আর দুরন্তপানা কমে যায়, তিনি হয়ে ওঠেন এক শান্ত সদালাপী সৌম্য কিশোরের মূর্তি। ছোটবেলায় গল্পের প্রতি আকর্ষণ এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে গল্প শুনে শুনে সোমেনের কল্পনা-প্রবণ মানস-প্রকৃতি গড়ে উঠেছিলো। উত্তরকালে এই কল্পনা-প্রবণতা তাঁর গল্প রচনায় নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছিলো।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নরেন্দ্রকুমার পুরোনো ঢাকার ঠাঁটারীবাজার এলাকায় একটা ভাড়া-করা বাড়িতে থাকতেন। এ-সময় নরেন্দ্রকুমার এতই আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাতেন যে, ঢাকার বাসায় পরিবারের সকলকে রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। ঢাকায় থাকতেন সোমেন ও তাঁর পিতা, পরিবারের অন্যরা থাকতেন কখনো বালিয়ায়, কখনো-বা বিক্রমপুরে। অভাবের সংসারে সোমেন চন্দকেই রান্নাঘরের কাজ সেরে স্কুলে যেতে হতো। সোমেন চন্দের বন্ধু 'ঢাকার চিঠি' গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক সরলানন্দ সেনের স্মৃতিতে দেখা যাক এ-প্রসঙ্গ:

> শুধু সোমেন ও তার বাবা শহরের বাসায়। আমি নিমন্ত্রিত। জানতাম না সোমেনের মা এখানে নেই। নম্বর খুঁজে বাড়ী বার করে বেলা বারোটায় দরজায় ধাক্কা দিতেই সোমেন এসে উপস্থিত। হাতে উনুনের কালি। মুসুরীর ডাল, ইলিশ মাছের ঝোল, সোমেনের হাতের রান্না—এই দিয়ে নেমতন্ন। গভীর আন্তরিকতা না থাকলে এই খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না এবং অপরকে সহজে আপন করার ক্ষমতা না থাকলে আজকের বুর্জোয়া সমাজে এমন নেমতন্ন সম্ভব হয়না।[৪]

এই অসচ্ছল পারিবারিক অবস্থা, পিতার কাছ থেকে পাওয়া দেশপ্রেম ও প্রগতির মন্ত্র এবং মানুষের দুঃখ-দৈন্য আর অভাব-অনটন দেখে ছোটবেলা থেকেই সোমেন একটা নতুন সমাজের স্বপ্ন এঁকেছে তাঁর মনের ক্যানভাসে এবং তখন থেকেই তার চৈতন্যের মৃত্তিকায় উপ্ত হয়েছে গণসাহিত্যের বীজ। বাস্তব অভিজ্ঞতা শৈশব থেকেই অলক্ষ্যে নির্মাণ করে চলছিলো সোমেনের গল্পের পট আর পাত্র। কৈশোর পেরিয়ে তিনি যখন পদার্পণ করলেন যৌবনে, তখন এই অভিজ্ঞতা আরো ঋদ্ধিশালী হলো, কিশোর মনের রোম্যান্টিকতা পেল দার্শনিক বিশ্বাসের ভিত আর বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হলো গণমুখী ধারার নতুন মাত্রা।

১৯৩৬ সালে সোমেন চন্দ ঢাকার পগোজ স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের জন্য মোট নম্বর থেকে সোমেন মাত্র ১১ নম্বর কম পেয়েছিলেন। এ-জন্যে সোমেনের কষ্টের শেষ ছিলনা। তখন প্রথম বিভাগ না পেলে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়া প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু যেহেতু সোমেনের বাবা মিটফোর্ড হাসপাতালের কর্মচারী, তাই কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট বিশেষ ক্ষমতাবলে সোমেনের ভর্তি হবার অনুমতি এবং বিনা বেতনে পড়ালেখার সুযোগ করে দেন। মা সরযু-বালার কিছু স্বর্ণালঙ্কার বিক্রী করে সোমেনের ডাক্তারী পড়ার বই কেনা হয়। নরেন্দ্রকুমার স্বল্প বেতনের কর্মচারী হলেও ছেলের পড়ালেখায় যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে রাখতেন সজাগ দৃষ্টি। সোমেনের মায়ের স্বপ্ন, তার ছেলে ডাক্তার হবে, কেটে যাবে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ—তাই সোমেন প্রথম থেকেই পড়ালেখায় হলেন যত্নশীল। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্তের অনেক স্বপ্নের মতো সোমেনের মায়ের স্বপ্নও সফল হলো না। নরেন্দ্র-কুমার নির্বাহ করতে পারছিলেন না পুত্রের মেডিকেল পড়ার খরচ। তাই সোমেনের পড়ালেখায় বেশ অন্তরায় সৃষ্টি হলো। এমন সময় সোমেন পড়লেন প্লুরিসিস বা ব্রঙ্কাইটিস জাতীয় কঠিন অসুখে। ফলে সোমেনের পক্ষে শ্রমসাধ্য ডাক্তারি পড়া আর হয়ে উঠলো না, তিনি পড়ালেখা ছেড়ে দিলেন। এ-সময় সোমেন চন্দ সংসারের আর্থিক দুবস্থা লাঘবের জন্যে কোন একটা কাজ করতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রকুমার সোমেনকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন, তাই রুগ্ন স্বাস্থ্যের সোমেনকে তিনি কোন চাকুরী

করতে দেননি। তবু সোমেন মাঝে মাঝেই চাকুরীর সন্ধান করেছেন, উদ্দেশ্য পিতার কষ্ট দূর করা। পরিবারের আর্থিক বিপর্যয়ের সময় কিছু না করে বসে থাকাটা তাঁর কাছে অপরাধ বলে মনে হতো। তাই বন্ধু সরলানন্দ সেনকে সোমেন একবার বলেছিলেন, "একটা কাজ ঠিক করে দিন, নয়ত morale ভেঙে যাবে।"[৫] সোমেন চন্দ কখনো কোন চাকুরী করেছেন কিনা তা জানা যায়নি, তবে তাঁর বন্ধুদের স্মৃতিকথার এমন কোন ইঙ্গিত নেই।

সোমেন চন্দের চেহারা কেমন ছিল, কেমন ছিল তাঁর স্বভাব, কি ধরনের পোশাক তিনি পড়তে ভালোবাসতেন? তিনি লাল বিদ্যাসাগরী চটি পড়তে পছন্দ করতেন, প্রগতি লেখক সংঘের অফিসে তিনি রোজই বিদ্যাসাগরী চটি পড়ে আসতেন, গায়ে প্রায়ই থাকতো সাধারণ পাঞ্জাবী কিংবা ধূসর রংয়ের একটা শার্ট। তাঁর দৈহিক অবয়ব দেখা যাক তাঁর বন্ধু অচ্যুত গোস্বামীর স্মৃতির লেখায় :

> হঠাৎ গেট থেকে অল্পদূরে একটি পরিচিত মুখ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গায়ে একটি অনেক পুরোন—রঙ-জ্বলে-যাওয়া ধূসর উলের চাদর, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। মাথাটা দেহের তুলনায় আয়তনে একটু বড়, মুখখানা চ্যাপ্টা—দাড়ি-গোঁফ ভাল করে ওঠেনি, দু'পাশের চোয়াল একটু উঁচু, একটু নীলচে চোখ দুটি বেশ বড় বড় আর স্বপ্নালু। একটু বেঁটে হলেও মানানসই চেহারা। তরুণ মুখখানিতে কোমল মাধুর্য।[৬]

কমলালেবুর মত উজ্জ্বল বর্ণ আর প্রশস্থ ললাটধারী সোমেন চন্দ ছিলেন স্বল্পভাষী, ছিলো তাঁর লাজুক স্বভাব—তার মানে এই নয় যে কিশোর বয়সে তিনি সব সময় মুখে হাঁড়ি দিয়ে বসে থাকতেন। শৈশবেই কঠিন অসুখে আক্রান্ত হলেও জীবনানন্দে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। বন্ধুরা যখন যুক্তি-তর্কে আর হাসি-ঠাট্টার একে অপরকে আক্রমণ করতো, সোমেন তখন দুর্বল এবং আক্রান্তকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। সরলানন্দ সেন এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "হাসি-ঠাট্টার ভিতরও একে অপরকে আমরা বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করতাম। এই বিদ্যায় সকলে সমান দক্ষ নয়। কিন্তু দুর্বল এবং আক্রান্তকে সাহায্য করত সোমেন। নিজেকে বাঁচিয়ে প্রতিপক্ষকে বাণ

ছুঁড়বার মতো বল যদি কারো না থাকত, সোমেন তার সাহায্যে ছুটে আসত। পৃথিবীর শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের জন্যে তার অন্তরে কতখানি দরদ ছিল, এর থেকেই সেই প্রমাণ পাওয়া যায়।''[৭] আহার-উৎসব-ভ্রমণে সোমেন সর্বদা থাকতেন অগ্রণী ভূমিকায়। তিনি ভালো গান গাইতে পারতেন না, কিন্তু গানের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন দুর্বলতা। মাঝে মাঝেই তাঁর কণ্ঠ থেকে গুন্‌গুনিয়ে উঠতো শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির কথা, তাদের বিজয়ের কথা—কখনো-বা স্বাধীনতার গান, তিমির হননের গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা আর গুন্‌গুন্ করা ছিল তাঁর প্রিয় অভ্যাস।[৮] ঘরে কি বাইরে, যখন থাকতেন তিনি একাকী, তখন প্রায়ই তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকতো 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো' কিংবা 'নদী আপন বেগে পাগল পারা'—রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমন সব চরণ।

১৯৩৭ সালের কথা, সোমেনের বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর। এ-সময় সোমেনরা ঠাঁটারীবাজারের বাসা ছেড়ে দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে ৪৭ নম্বর লাল-মোহন সাহা স্ট্রীটে একটি ভাড়া-বাড়িতে থাকতেন। মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সোমেন চন্দ এখন একজন কর্মহীন তরুণ; তাঁর বুকের মধ্যে সৃষ্টির উন্মাদনা, সংসারের অভাব মোচনের উদগ্র বাসনা। কিন্তু সোমেন কিছুই করতে পারছেন না। জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে সোমেন চন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সোমেন ও তাঁর বন্ধুরা যেন সন্ধান পেলেন নতুন দিগন্তের। সন্ত্রাসবাদীদের জনগণ-বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সোমেন পরিচিত হলেন, কিন্তু এদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধান্বিত হতে পারলেন না।[৯] তাই বন্ধুদের নিয়ে তিনি সাহিত্যকর্মের মাঝেই নিয়োজিত থাকলেন আরো কিছু দিন। তবে প্রাক্-যৌবনে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সোমেনের পরিচয় ভাবীকালের কমিউনিস্ট সোমেনকে আলোড়িত করেছিলো, তিনি সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্যে তখন থেকেই স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন। সোমেন চন্দের এ-সময়কার মানস-প্রবণতা বিশ্লেষণ-সূত্রে জ্ঞান চক্রবর্তীর মন্তব্য স্মরণীয়:

> ১৯৩০ সালের প্রথম ভাগ থেকে অবিভক্ত বাংলায় যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায় এবং সে-আন্দোলনকে দমানোর জন্য তদানীন্তন বাংলার কুখ্যাত গবর্নর এন্ডারসন সাহেব যে পাল্টা সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করে তার ফলে স্বভাবতই যেমন সোমেনকে

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে, অপরদিকে আবার সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক তীব্র ঘৃণা। এর ফলে ছোটবেলা থেকেই তিনি বন্ধু হিসেবে বেছে নেন বিপ্লবী আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের। ১৯৩৪ সালের পর থেকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে বিপ্লবীদের ভিতরে সৃষ্টি হয় নতুন জিজ্ঞাসা এবং ব্যাপক সংখ্যায় মার্কসবাদে দীক্ষিত হতে আরম্ভ করেন। সোমেনের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর। এ-রকম অল্প বয়সে আমাদের দেশে অজানা এ রকম মতবাদ নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করা কারু পক্ষেই সম্ভব নয়। তদুপরি তখন সমস্ত বাংলায় বিশেষ করে ঢাকায় এমনি এক সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল যে কোন রকম বিপ্লবী মতবাদ প্রচার কিংবা তা নিয়ে আন্দোলন একেবারই সম্ভব ছিলনা। অথচ তার মত ছেলের পক্ষে চুপ করে থাকাটাও ছিল অসম্ভব। সে সময় হতেই তার গল্প লেখার শুরু। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা মনে চেপে রেখেও তিনি ঢাকার তৎকালীন উদীয়মান একদল সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।[১০]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শৃংখল থেকে ভারতের মুক্তি-প্রত্যাশায় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতবর্ষে শুরু হয় গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। ব্রিটিশ শাসকরা সন্ত্রাসবাদী নেতাদের বন্দী করে কালাপানির দেশ আন্দামান জেলে পাঠাতে লাগলো। আন্দামান জেলে বন্দী বীর সন্ত্রাসবাদীরা কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন (১৯৩৪) গঠন করে ক্রমে সন্ত্রাসবাদের ভ্রান্ত পথ পরিহার করে মার্কসবাদ-লেলিনবাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কমিউনিস্ট হয়ে ওঠেন। সন্ত্রাসবাদী পথ পরিহার করে কমিউনিস্ট হয়ে-ওঠা এমন একজন বীর স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নাম সতীশ পাকড়াশী।[১১] ১৯৩৮ সনে আন্দামান জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সতীশ পাকড়াশী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পূর্ববাংলার ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে ১৯৩৯ সনের প্রথম দিকে পার্টির উর্ধ্বতন কমিটির নির্দেশে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। এই সতীশ পাকড়াশীর সান্নিধ্যে এসে ১৯৩৯ সন থেকে সোমেন চন্দের জীবনদর্শন ও জীবনবিশ্বাসে আসে মৌল পরিবর্তন। তিনি সোমেন চন্দকে কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়ে আসার জন্যে পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কখনো ভিক্টোরিয়া

পার্কের সবুজ লনে, কখনো গেণ্ডারিয়ার ধূপখোলা মাঠে, কখনো-বা চাঁদনী রাতে বুড়ীগঙ্গার তীরে সতীশ পাকড়াশী সোমেন চন্দ ও তাঁর সাথীদের রাজনীতির নানা কথা বলতেন, শুনাতেন ওঁদের মার্কস আর লেনিনের নানা তত্ত্ব। যেহেতু সোমেন ও তাঁর বন্ধুরা সাহিত্য-সম্পর্কে ছিলেন অধিক আগ্রহী, তাই সতীশ পাকড়াশী দেশী-বিদেশী বিপ্লবী সাহিত্যিকদের জীবন আর কর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন বেশী।[১২] এভাবেই কখনো মানবজাতির কল্যাণে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে শহীদ র‍্যালফ ফক্স (১৯০০-১৯৩৭), ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭), জন কর্নফোর্ড (১৯১৫-১৯৩৬) হয়ে উঠতেন তাঁদের আলোচনার বিষয়; কখনো-বা ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬), আঁদ্রে মালরো (১৯০১-১৯৮০) কিংবা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৮-১৯৬১) ওঁদের চৈতন্যের পরতে পরতে বুলিয়ে যেত সীমাহীন সাহস আর প্রেরণার সুবাতাস। সাহিত্যিকও যে সমাজ-বিবর্তনে রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান, সোমেন চন্দ এখন যেন সে-ভাবনায় একটা বিশ্বাসের ভিত পেয়েছেন। তাই ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শহীদ বীর লেখক র‍্যালফ ফক্স আর ক্রিস্টোফার কডওয়েল যেন হয়ে ওঠে সোমেনের আদর্শ, তাঁর প্রেরণার অনির্বাণ শিখা। এ-প্রসঙ্গে সতীশ পাকড়াশীর স্মৃতির শরণ নেয়া যাক:

> মহৎ কর্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথা যায়না। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলন্ডের তরুণ বিপ্লবী-সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্স-এর আত্মদান গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।...ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে বসে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাই হচ্ছিল। আগ্রহভরা গভীর প্রাণে সোমেন ভাবছিল—স্পেনে জনগণের জাগরণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জাতিক বাহিনী—ব্রিটেনের গণ-সাহিত্যিক, ব্রিটেনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট র‍্যালফ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান—স্পেনের জনগণের ধন-সম্পদের মালিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম—বিদেশী কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও রাজনীতিক কর্মীদের জীবন-উৎসর্গ—এই ভাব, বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার হলো। সোমেন জিজ্ঞাসুভরা প্রাণে বলে উঠলো,—"সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো?" আমি বললাম: "অত্যাচার যখন চরমে

উঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারী ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নূতন সাহিত্যে তৈরী হয়। ধন-শোষণ-মদমত্ত ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য-সাধনায় লাঞ্ছিত গণ-মানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলার যে-প্রেরণা, সেই প্রেরণাই লেখককে গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ করে শুনে একটু পরে বললো : "এঁরাই সত্যিকার সাহিত্যিক।" রাত্রিতে আমরা ফিরলাম। সোমেন তার গুটি দুই-তিন লেখক-বন্ধুদের নিয়ে নূতন সাহিত্যের কথা বল্‌তে বল্‌তে বাড়ি গেল।[১৩]

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে আন্দামান-ফেরত মার্কসবাদে দীক্ষিত বিপ্লবী কমিউনিস্টরা ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈশুণ্ডির জোড়পুর লেনে একটা অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। 'কমিউনিস্ট পাঠচক্র' নামে গোপন ক্লাসের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী ও যুবসমাজকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী দর্শনে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই পাঠচক্রের মূল লক্ষ্য। কমিউনিস্টদের এই পাঠচক্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সতীশ পাকড়াশী, জ্ঞান চক্রবর্তী, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ। কখনো কখনো পশ্চিমবঙ্গ থেকেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে প্রখ্যাত পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনা হতো এই পাঠচক্রে। এখানে প্রায় প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হতো শ্রমিকদের নিয়ে গোপন বৈঠক ও আলোচনা সভা। সোমেন চন্দের ৩৭ নম্বর লালমোহন সাহা স্ট্রীটের বাসা ছিল কমিউনিস্টদের এই অফিসটির অতি কাছে। কিশোর সোমেন চন্দ সময়-অসময়ে প্রায়ই আসতেন এই পাঠচক্রে, তন্ময় হয়ে আলোচনা শুনতেন, কখনো-বা লাজুক এই ছেলেটি দু' একটা প্রশ্নও করে বসতেন। সতীশ পাকড়াশীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সোমেন চন্দ কমিউনিস্ট পাঠচক্রের সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করা, কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলা—এসব আলোচনা কিশোর সোমেনের স্বপ্নবিলাসী মনে এনে দিলো একটা দার্শনিক বিশ্বাসের ভিত ; সাম্যবাদী দর্শন দিলো তাঁকে নতুন প্রেরণা। আগ্রহ-আন্তরিকতা-নিষ্ঠা

এবং কর্ম-তৎপরতার মধ্য দিয়ে সোমেন অল্পদিনেই মার্কসবাদী নেতা ও কর্মীদের কাছে আপন মানুষের পরিণত হলেন। শুরু হলো ডাক্তার না-হতে-পারা এক কিশোরের রাজনৈতিক জীবনের মৈনাক-অভিযাত্রা।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে সোমেন আর কমিউনিস্ট পাঠ-চক্রের শ্রোতা থাকলেন না, নিজেই হয়ে-উঠলেন এর একজন সক্রিয় সংগঠক। সোমেনের উৎসাহ এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে কমিউনিস্ট নেতারা তাঁর উপর এই পাঠচক্রের প্রকাশ্য শাখা 'প্রগতি পাঠাগার' পরিচালনার ভার দেন। পাঠাগার পরিচালনায় সাফল্য, তাত্ত্বিক জ্ঞান, শ্রমিক-কৃষকের জন্যে সহমর্মিতা, গণসাহিত্য রচনায় আগ্রহ—সোমেনের এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির[১৪] নেতারা এ-সময় তাঁকে পার্টি সংগঠনে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু যেহেতু সোমেনের স্বাস্থ্য ছিল দুর্বল, তাই তাঁকে সরাসরি পার্টিতে নিয়ে আসতে তাঁরা কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। সোমেন চন্দ জানতেন এবং প্রায়ই বলতেন, 'কমিউনিস্ট হওয়া এক কঠিন সাধনা, নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি হলেই তবে একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়া যায়।'[১৫] এ-সময় থেকেই সোমেন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হবার গৌরব-প্রত্যাশী ছিলেন। সোমেনের চৈতন্যের সাথী অচ্যুত গোস্বামীর স্মৃতিতে আছে সেই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত:

> সোমেন কাছে এলে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি লেবর ফ্রণ্টে আছেন?' আমি শুধু এটুকু জানতাম যে সোমেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। তখনো সে সমর্থক, না পার্টি সভ্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে—তা অবশ্য ঠিক জানতাম না। পার্টির তখন বে-আইনী অবস্থা। কাজকর্ম দু'ভাগে বিভক্ত। কতক কাজ হয় গভীর গোপনীয়তার মধ্যে, আবার কতক হয় আধা প্রকাশ্যে। সুতরাং এ-অবস্থায় কোথায় কাজ করছে তা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও বলা নিষেধ ছিল।
>
> সোমেন একটু লাজুক লাজুক হাসি হেসে বলল, 'নেতারা কি সহজে নিতে চান? কত ওজোর আপত্তি! আমার স্বাস্থ্য খারাপ, এত পরিশ্রম সইতে পারবো না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও নাছোড়। প্রোলেটারিয়েট পার্টির শক্তির উৎস। এ যুগের রাজনৈতিক পালা-বদলে প্রোলেটারিয়েটের ভূমিকাই অগ্রণী। তাদের মধ্যে যদি

কাজ করতে না পারলাম, তবে সৌখীন কমিউনিস্ট বলে নাম কিনে লাভ কি ?'[১৬]

প্রথম দিকে (১৯৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দ) সোমেন চন্দ কমিউনিস্ট পার্টির ছোট-খাট কাজ করতেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে দেয়ালে সেঁটে দেয়ার জন্যে তিনি সুন্দর সুন্দর পোস্টার লিখতেন। পার্টি নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে তিনি শ্লোগানের বিষয় জেনে নিতেন; তারপর নিজস্ব ভাষায় তিনি পোস্টারগুলোকে জীবন্ত করে তুলতেন। তিনি কখনো কখনো পোস্টারে বিভিন্ন ছবিও আঁকতেন। ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁর শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিলনা। তাঁর স্বাস্থ্য এতই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে, তাঁকে ভালো ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পিতা নরেন্দ্রকুমার মিটফোর্ড হাসপাতালে চাকুরী করতেন, অনেক ডাক্তারই তাকে চিনতেন এবং ভালোবাসতেন। তাই সোমেনকে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করানো নরেন্দ্রকুমারের জন্যে ছিলনা কোন কঠিন কাজ।[৮] কিন্তু এ-সময়ে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সোমেনের কোন দৃষ্টি ছিলনা। প্রগতি পাঠাগার পরিচালনা, ঢাকা রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ করা, পার্টির গোপন কাজ করা, রাত জেগে গল্প লেখা——সব মিলে তরুণ সোমেন তখন কর্মচঞ্চল বিশ্রামহীন সময় অতিক্রম করছেন। সমাজ-বদলানোর এক দুর্নিবার আকর্ষণে দ্রোহী তরুণ সোমেন তখন কেবলই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন——এ-সময় শরীরের জন্যে পিছনে ফিরে তাকানো তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে।

অসুস্থতা সত্ত্বেও সোমেন চন্দের আগ্রহ, আন্তরিকতা ও কর্মদক্ষতায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তাঁকে পার্টি সভ্যপদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উনিশ বসন্তের সৌরভ-মাখা যে-তরুণ বলে, 'রেভ্যলুশ্যনের সময় আমি ভ্যানগার্ডে থাকতে চাই''[১৭]——তাঁকে কতকাল আর অসুস্থতাজনিত কারণে পার্টি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়? ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময় সোমেন চন্দ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-পদ লাভ করেন।[১৮] এভাবে বালিয়া-বিক্রমপুরের পাড়া গাঁয়ের এক লাজুক ছেলে, ডাক্তার না-হতে-পারা সোমেন চন্দ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেয়ে পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে ভ্যানগার্ডের সেনানী হয়ে রাজনৈতিক জীবনের পরম গৌরবকে অঙ্গীকার করেন।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারত সরকার 'ভারত রক্ষা আইন' জারী করে। যুদ্ধবিরোধী যে-কোন প্রচার এবং সরকারের যে-কোন সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এই আইনের মাধ্যমে। যদিও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ইংল্যান্ড ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবু যেহেতু সে-যুদ্ধ ছিল বিশ্বকে ভাগ করে নেয়ার এক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের জাল, তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল। ভারতের জনবল, অর্থ-সম্পদ প্রভৃতি যুদ্ধের জন্য যাতে ব্যবহার করা না হয়, সে-জন্য পার্টি তখন জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ফলে, অচিরেই পার্টির সকল কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং পার্টি-নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। ঢাকা জেলা পার্টির অনেক সংগঠক বন্দী হলেন, বাকিরা চলে গেলেন 'আন্ডারগ্রাউন্ডে'। ১৯৪০-৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির এই বিপদের দিনে সোমেন চন্দ পার্টির কর্মকাণ্ড সচল রাখার ক্ষেত্রে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যেহেতু সোমেনের বয়স ছিল কম, তাই তখনো তাঁর নাম পুলিশের খাতায় ওঠেনি। ফলে তিনি প্রকাশে চলা-ফেরা করতেন। পার্টির সংবাদ এক কমরেডের কাছ থেকে অন্য কমরেডের কাছে পৌঁছে দিতেন, যুদ্ধবিরোধী প্রচারণার দায়িত্বও নিজেই কাঁধে নিয়ে পুরো ঢাকা শহরে ঘুরে ঘুরে জনমত গড়ার চেষ্টা করতেন। কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনি যুগে কাজ-কর্ম ছিল দু'ভাগে বিভক্ত——একান্ত গোপনীয় এবং আধা প্রকাশ্য। দু'ধরনের কাজেই সোমেন চন্দ পার্টি নেতৃত্বের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনি যুগে সোমেন চন্দের বাসাও হয়ে-ওঠে কমিউনিস্টদের একটা গোপন আশ্রয়স্থল। বিপ্লবীদের অনেকেই মাঝে মাঝে সোমেনের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন, কেউ রাত কাটাতেন, কেউবা দুপুরে কয়েক ঘণ্টা থেকে অন্যত্র চলে যেতেন। সোমেন চন্দ সকলকেই সাদরে গ্রহণ করতেন এবং যত্নের সঙ্গে তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করতেন। কখনো কখনো তাঁদের বাসায় কমিউনিস্টদের গোপন বৈঠকও হতো। বাড়িতে এতসব কাণ্ড হচ্ছে, এ-কথা কিন্তু সোমেনের পিতা নরেন্দ্রকুমার বিন্দুমাত্রও জানতেন না। কারণ তিনি অফিসে যেতেন খুব সকালে, আর ফিরতেন প্রায়ই রাত দশটার পরে। সন্ধ্যায় অফিস থেকে

বেরিয়ে একটা পরিচিত ফার্মেসিতে দৈনিক পত্রিকা আদ্যোপান্ত পড়া ছিল তাঁর প্রিয় অভ্যাস। দোকানের কর্মচারিদের তিনি দেশ-বিদেশের নানা প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন, শুনাতেন যুদ্ধের বিভিন্ন সংবাদ। অবশেষে এক সময় ক্লান্ত দেহে দীর্ঘ দু'মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরতেন। তাই তার পক্ষে বাড়িতে কি ঘটছে, তা জানা সম্ভব ছিলনা। সোমেন ও তাঁর মা এ-বিষয়ে নরেন্দ্রকুমারকে কিছুই বলতেন না। কমিউনিস্টদের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলই শুধু নয়, সোমেনদের বাড়িতে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ক্লাসও অনুষ্ঠিত হতো। বাবা সরকারি অফিসের কর্মচারি। তার বাড়িতেই কমিউনিস্টদের আশ্রয়—এ-কথা পুলিশ জানলে বাবার চাকুরি থাকবে না—তা জেনেও সোমেন চন্দ কোনদিন ইতস্তত করেননি কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কাজকর্ম পরিচালনায়, কিংবা বাড়িতে রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠানে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রতি এমনি ছিল তাঁর ভালোবাসা আর আনুগত্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি যখন নিষিদ্ধ, তখন ঢাকা রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেয়ার মতো সংগঠকের খুব অভাব। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল তখন ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে শক্তিশালী গণসংগঠন। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের পরিধিও ছিল বেশ বিস্তৃত—নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জঘাট থেকে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত। তখন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কাজ করা, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলা ছিল এক প্রায়-দুঃসাধ্য কাজ। কমিউনিস্ট পার্টি ইতোমধ্যে সোমেন চন্দের কর্মদক্ষতা এবং আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছে, তাই এই দুরূহ কর্মের ভার পড়লো মাত্র বিশ বছর বয়সের এক যুবকের ওপর। প্রধানত দুটি কারণে রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের দায়িত্ব সোমেন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত থেকে নিজেকে একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তোলা এবং বিপ্লবের জন্যে কাজ করা; দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কাজ করার ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন, তা তাঁর লেখকজীবনকে বৈচিত্র্যময় করবে, রচনায় আসবে প্রত্যক্ষতার উত্তাপ আর প্রাতিস্বিকতার ছাপ—নিশ্চয়ই এ-ছিল তাঁর গোপন প্রত্যাশা। সোমেন চন্দ উভয় ক্ষেত্রেই বিস্ময়কর সাফল্যকে করতলগত করেছিলেন—আন্দোলনের হাত আর সৃষ্টির হাত সমান চলেছে তাঁর, যেন তিনি নবীন সব্যসাচী।

তখনকার শ্রমিকদের মধ্যে ছিল নানা স্তর, তাদের সমস্যা জটিল এবং বহুবিধ, তাদের মধ্যে নেই কোন রাজনৈতিক চেতনা। এই শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই ছিল সোমেন চন্দের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে কতটুকু তিনি সফল হয়েছিলেন? কিভাবে তিনি কাজ করতেন অনগ্রসর শ্রমিকদের মধ্যে? দেখা যাক এ-প্রসঙ্গ তাঁর বন্ধু অচ্যুত গোস্বামীর স্মৃতির স্বাক্ষরে: "এখনকার শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা দেখে সে-সময়কার শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা কল্পনা করা যাবেনা। একালে ইউনিয়নগুলি এত শক্তিশালী এবং কেন্দ্রীভূত যে এক ডাকে সমস্ত জুটমিলগুলো বা শত শত চা বাগানের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকশ্রেণীর এই সংহতি এবং রাজনৈতিক চেতনারও তখন চিহ্নমাত্র ছিলনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এদেশে বেকারী দারিদ্র্য এবং অনাহার চরমে উঠেছিল। বাজারে প্রতিদিন জিনিসের দাম কমছে, তবু ক্রেতা নেই। চারদিকে ছাঁটাই; যে দু'চারজন কলকারখানায় বা আপিসে তখনো কাজ করছে, তারা চাকরি যাওয়ার ভয়ে অস্থির। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করতেও লোকের [প্রাণ] ভয়ে কাঁপে। সেই চরম আর্থিক ও মানসিক দারিদ্র্যের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করা যে কি বিড়ম্বনার ব্যাপার ছিল তা তখনকার অবস্থা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কেবল তাঁরাই বুঝতে পারবেন। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যেখানে শ্রেণীবিদ্বেষ নয়, শ্রেণীআতঙ্ক সর্বাত্মক মনস্তত্ত্ব হিসাবে বিরাজমান, সেখানে বিংশতিবর্ষ অনুত্তীর্ণ একটি বালক (সোমেন চন্দ) চরমতম হতাশার বিরুদ্ধে কাজ করছে, এবং তার প্রত্যয়বোধ এতটুকু শিথিল হচ্ছে না!"[১৭]

রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন পরিচালনা, বিভিন্ন শাখা-সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, গোপন সভা ও নেতৃবৃন্দের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা—প্রভৃতি দায়িত্ব সোমেন দক্ষতার সঙ্গে একাই পালন করতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ-কঠিন দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি তখন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র মূল দায়িত্বও পালন করছিলেন। তিনি যেমন ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন, একই সঙ্গে তেমনি দিনের পর দিন লাইনে লাইনে ঘুরে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, তাদের সমস্যা বুঝে সমাধানের পথ বলে দিয়েছেন, রাতের পর রাত জেগে শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। যে-শ্রমিকরা অক্ষরজ্ঞানহীন,

রাত জেগে তাদের অক্ষর-জ্ঞান শিখিয়েছেন, না-খেয়ে শ্রমিকদের বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কখনো-বা রাতে কর্মক্লান্ত হয়ে ইউনুস কি সামসু বা অন্য নামের কোন-এক শ্রমিকের অপরিচ্ছন্ন বিছানায় পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই মহান যুবককে কখনো দেখা যেত কারখানার গেটে, কখনো ইঞ্জিনঘরে, কখনো-বা ইঞ্জিনসেডের কাছে কয়লার ধোঁয়ার নীচে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছেন শোষিত শ্রমক্লান্ত মজুরের সঙ্গে—তাদের আহ্বান করছেন লাল পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হতে; হয়তো তাদের শুনাতেন কার্ল মার্কস আর ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পৃথিবী-বদলে-দেয়া এই বাণী—'শৃঙ্খল ছাড়া শ্রমিকের হারাবার আর কিছুই নেই।'[২০]

রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে মাত্র দু'মাস কাজ করার পরই সোমেন হয়ে-ওঠেন শ্রমিকদের অত্যন্ত আপনার লোক; তারা এই তরুণ বিপ্লবীকে প্রথম থেকেই বিশ্বাস করতো, ভালোবাসতো। সোমেনের অনুপ্রেরণায় যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রায় সকল শ্রমিক কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকার নীচে সমবেত হলো। শ্রমিকদের স্বার্থ কিভাবে আদায় করা যায়—এটাই ছিল সোমেনের প্রধান চিন্তা। তাই রেল বিভাগের জাঁদরেল অফিসারদের সঙ্গে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন। এ-ধরনের আলোচনায় সুচতুর রেলকর্মচারীদের সমস্ত রকম কৌশল তিনি ব্যর্থ করে দিতেন, তাদের নতি স্বীকার করতে বাধ্য করতেন। রেল-কর্মচারীরা এই তরুণের যুক্তি-তর্ক আর সাংগঠনিক দক্ষতায় আশ্চর্য হয়ে যেত।[২১] রেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভয় পেতো দুটো কারণে—এক. তাঁর দৃঢ়তা ও সারল্যের জন্যে, দুই. তাঁর অল্প বয়সের জন্যে। সোমেনের প্রচেষ্টায় রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করে। তাঁরই সাংগঠনিক দক্ষতার ফলে ফুল-বাড়িয়া স্টেশন-সংলগ্ন তৎকালীন রেল কোয়ার্টারসটি কমিউনিস্টদের গোপন কাজকর্মের একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সোমেন চন্দ যেমন শ্রমিকদের আপন করে নিয়েছিলেন, তেমনি শ্রমিকরাও কমরেড সোমেন চন্দকে। শ্রমিকদের মধ্যে যারা অক্ষরজ্ঞানহীন ছিল, তাদের জন্যে সোমেনের কাজ ছিলো বেশ কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রমিকদের যে আবেদন করতে হতো, রাতজেগে সেগুলো তিনিই লিখে রাখতেন। মেহনতি মানুষেয জন্যে একজন কমিউনিস্টের

কি অপরিসীম ভালোবাসা। প্রতি রাতেই সোমেনকে ২০/২৫ খানা দরখাস্ত লিখতে হতো। ভোর হতে-না-হতেই শ্রমিকরা এসে দরখাস্তগুলো নিয়ে যেতো। সমীন্দ্রকুমার হোর এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি কতকগুলো দরখাস্তের ওপর একখানা 'প্রভাতী' পত্রিকা পড়ে রয়েছে। দরখাস্তগুলো দেখেই বুঝলাম, রেলওয়ে শ্রমিকদের দরখাস্ত। রোজ ২০/২৫ খানা দরখাস্ত ওকে লিখে দিতে হয়। হয়তো এক্ষুণি আরও দু'তিন জন শ্রমিক এসে পড়বে সাদা কাগজ নিয়ে লেখার জন্যে।"[২২]

রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে সোমেন চন্দ অতি অল্প সময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জন করেন, তাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তাঁকে এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। পার্টির ডাকে তিনি সাড়া দেন এবং ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মাত্র বিশ বছরের এক যুবকের জন্যে এ-ছিল দুর্লভ সম্মান। এ-সময়ই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সভ্যপদ লাভ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) কিংবা বিষ্ণু দে-র (১৯০৯-১৯৮২) চেয়ে বয়সে এক যুগ ছোট হয়েও সোমেন চন্দ তাঁদের তিন বৎসর পূর্বেই (১৯৪১) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। শ্রমিক ইউ-নিয়নের সাধারণ সম্পাদক হবার পর রেল কর্তৃপক্ষের জাঁদরেল লোকেরা তাঁকে আরও ভয় পেতে লাগলো ; তাদের ক্ষুরধার কূটবুদ্ধি হার মানতো সোমেনের দৃঢ়তা ও সরলতার কাছে। এভাবে অতি অল্প দিনেই সোমেন হয়ে উঠলেন রেলওয়ে শ্রমিকদের এক অবিসংবাদিত নেতা, অথচ এ-সময় তাঁর জীবন অতিক্রম করেছে মাত্র বিশটি বসন্ত।

জীবনের এই পর্বে সোমেন চন্দ লেখার দিকে বেশী মনোযোগী হতে পারেননি ; বরং অনেক বেশী আগ্রহী ছিলেন রাজনীতির তত্ত্বগত ভিত নির্মাণে আর হতে চেয়েছেন জনজীবন ও মৃত্তিকামূলসংলগ্ন। শ্রমিকদের বস্তিতে বস্তিতে সময় কাটানো ছাড়াও, তিনি ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে কৃষকদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতেন, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যে সহানুভূতির হাত বাড়াতেন। সারল্য, আন্তরিকতা এবং মানুষের সমস্যাকে দরদ দিয়ে দেখার ফলে তাঁর উপস্থিতি এবং দু-একটা কথাই

শ্রমিক-কৃষকের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান এনে দিত। যে-কোন শ্রমিক-কৃষকই তাঁকে গ্রহণ করতো তাদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে।[২৩]

একদিকে ব্রিটেন-ফ্রান্স প্রভৃতি পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে জার্মানি-ইতালি-জাপান এই তিনটি ফ্যাসিস্ট শক্তির মধ্যে পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধবিরোধী জনমত গড়ার জন্যে সর্ব-শক্তি নিয়োগ করলেও, ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার-বাহিনী পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিণত হলো জনযুদ্ধে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিবর্তন করলো জনযুদ্ধের নীতি। হিটলার নিজ দেশের রণসম্ভারের সাথে ইউরোপের পদানত দেশসমূহের সকল সামরিক শক্তি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। প্রথম অবস্থায় হিটলার বাহিনীর আক্রমণে কৌশলগত কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমশ পিছু হটতে থাকে ; এ-অবস্থায় কমিউ-নিস্ট ব্যতীত আর সকল মানুষেরই এমন ধারণা জন্মে যে সোভিয়েতের পরাজয় সময়ের প্রশ্ন মাত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্যে স্ট্যালিন (১৮৭৯-১৯৫৩) বিশ্ববাসীর কাছে ফ্যাসিস্ট বিরোধী মোর্চা গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানান। কিছুদিন পূর্বেও যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পৃথিবী ভাগ করে খাওয়ার যুদ্ধ, এখন তা-ই পরিণত হয় পৃথিবীর স্বাধীনতাকামীদের জনযুদ্ধে, দেশে দেশে গঠিত হতে থাকে ফ্যাসিস্টবিরোধী জনযুদ্ধের মোর্চা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের নীতি পরিবর্তন করে ইংল্যান্ড-আমেরিকা-সোভিয়েতের মৈত্রী জোটকে সমর্থন করে।

এই ক্রান্তিলগ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই জনমত গড়ে তোলার সচেষ্ট হয় যে, ফ্যাসিস্টবিরোধী যুদ্ধ ভারতসহ পৃথিবীর মুক্তিকামী জাতি-সমূহেরই মুক্তিসংগ্রাম। সোভিয়েতের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত সবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'।[২৪] বাংলা সাহিত্যের প্রগতি-শীল লেখকরা এই সমিতি গঠনে পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কলকাতায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠিত হলে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য অঞ্চলেও এই সমিতির শাখা গঠন করে সোভিয়েতের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন জেলা কমিটিকে নির্দেশ দেয়। এ-সূত্রেই ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন প্রগতিশীল কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঢাকাস্থ 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র উদ্যোগে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সদরঘাটের নিকটবর্তী ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সপ্তাহব্যাপী এক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউ-নিয়নের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা। চিত্র-প্রদর্শনী আয়োজনের মূল সংগঠক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রণেশ দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ প্রমুখ। দৈনিক প্রায় তিন হাজার দর্শনাকাঙ্ক্ষী এই প্রদর্শনী দেখতে আসতেন।[২৫] সপ্তাহব্যাপী এই চিত্র-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এই চিত্র-প্রদর্শনীকে 'সোভিয়েত মেলা' বলে আখ্যায়িত করেন। সেই উন্মাতাল দিনে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে সংগঠকদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রদর্শনীর অন্যতম সংগঠক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> আজ শুনতে অবাক লাগবে যে তখনকার দিনে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের সমাজ-জীবন সম্পর্কিত চিত্রাবলী সংগ্রহ সহজসাধ্য ব্যাপার ছিলনা। অল্প সময়ের মধ্যে যেসব বই দ্রুত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল তা থেকেই বিভিন্ন ছবি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের সাহায্যে বড়ো আকারের প্রায় শ'খানিক ছবির এই প্রদর্শনী যথাসময়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল। ঢাকা শহরে এই ধরনের একটি ব্যাপার তখনকার দিনে একেবারেই নতুন। লক্ষ্য করা গেল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্র-প্রদর্শনী গৃহে অজস্র লোকের সমাবেশ। অধ্যাপক, লেখক, সঙ্গীত-শিল্পী, ক্রীড়াবিদ, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ পর্যন্ত সকলেই উৎসাহের সঙ্গে এই চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে ভীড় করেছিলেন।[২৬]

'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির' উদ্যোগে আয়োজিত এই চিত্র-প্রদর্শনীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে সোমেন চন্দ পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনিই ছিলেন এই আয়োজনের সবচেয়ে পরিশ্রমী কর্মী-সংগঠক। সাধারণ মানুষকে চিত্রগুলো বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে 'চিত্র-পরিচায়কদের' একজন ছিলেন সোমেন চন্দ। এ-কাজে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী প্রাণবান ও উৎসাহী। সোমেন যেখানে চিত্রগুলো ব্যাখ্যা করতেন, দেখা যেতে সে-খানেই বেশী দর্শক এসে জমা হচ্ছেন, ভীড় করছেন। তিনি যখন গল্প বলার ভঙ্গিতে লেনিনের দেশের কথা বলতেন, ম্যাক্সিম গোর্কির পাভেল আর পেলগায়া নিলভানার কথা শোনাতেন, তখন তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো— সাধারণ মানুষ পেত অন্তহীন অনুপ্রেরণা।

সোমেনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' ফ্যাসিবিরোধী জনমত গড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ঢাকা শহরে 'সোভিয়েত মেলা'-র পর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ এবং নারায়ণগঞ্জেও সমিতির কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়। এ-ক্ষেত্রেও সোমেনের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সহযোগিতায় ফ্যাসি-বিরোধী একগুচ্ছ কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ ও গান এবং কিছু পোস্টার নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ-ভাবে সোমেন চন্দ হয়ে ওঠেন ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের এক মৃত্যুহীন প্রাণ, প্রগতিশীল চেতনার অনির্বাণ শিখা।

রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সাহিত্য-কর্মী হিসেবে সোমেন চন্দের জীবন উজ্জ্বল কীর্তিতে ভাস্বর। যে-চেতনায় বিপ্লবের সময় তিনি ভ্যানগার্ডে থাকতে চেয়েছেন, সেই চেতনা-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাহিত্য। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তাঁর গল্প-কবিতা স্কুলের হাতে-লেখা পত্রিকায় বের হতো। প্রথম জীবনে তিনি রোম্যাণ্টিক প্রেমের গল্প লিখতেন। প্রেমের গল্প লিখলেও, এ-পর্বেই বোঝা যেত, সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্রণেই তিনি বেশী উৎসাহী। ক্রমশ রাজনীতির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে, তিনি আত্মনিয়োগ করেন গণমুখী সাহিত্য-রচনায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কালখণ্ডকে সোমেনের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্ব হিসেবে ধরে নেয়া যায়; আর দ্বিতীয় পর্ব ১৯৩৯ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত

(৮ মার্চ, ১৯৪২)। প্রথম পর্বে তিনি গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্রণে ছিলেন আগ্রহী; এ-সময় তাঁর আদর্শ ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'গ্রাম-জীবনকে যে সোমেন একজন লেখক হিসেবে এমন গভীরভাবে ভালো-বেসেছিলেন তার মূলে বিভূতিভূষণের রচনার—বিশেষ করে 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'-র প্রভাব বড়ো কম ছিলনা।'[২৭] 'দ্বিতীয় পর্বে তাঁর প্রধান অনু-প্রেরণা ছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কি, র‍্যালফ ফক্‌স এবং ক্রিস্টোফার কডওয়েল।[২৮]

সোমেনের সাহিত্যিক-জীবনের এই পর্বান্তর সূচিত হয় একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার অনুপ্রেরণায়। ১৯৩৫ সালে হিটলারের নেতৃত্বে যখন জার্মানিতে হত্যা-গ্রেপ্তার-বহিষ্কার-বই পোড়ানো ইত্যাদি চলছিল নির্বি-চারে, ইতালিতে প্রগতিকামী গণতান্ত্রিক শক্তির কণ্ঠরোধ করে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনী যখন আবিসিনিয়া আক্রমণে উদ্যত, জাপানের সমর-নায়কদের মধ্যে যখন হিংস্র যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছে, তখন রঁম্যা রঁলা (১৮৬৬-১৯৪৪), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) এবং অাঁরি বারব্যুস (১৮৭৬-১৯৩৫) ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্যে পৃথিবীর অগ্রগণ্য প্রগতিশীল মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উল্লিখিত তিন মহান সাহিত্যিকের ডাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সংখ্যক প্রগতিশীল সাহিত্যিক যোগ দেন। এ-সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন রঁম্যা রঁলা, ম্যাক্সিম গোর্কি, অাঁরি বারব্যুস, অাঁদ্রে জিদ, (১৮৬৯-১৯৫১), ই. এম. ফর্স্টার (১৮৭৯—), অাঁদ্রে মালরো (১৯০১-১৯৮০), অডলাস হাক্‌সলি (১৮৯৪-১৯৬৩), জুলিয়া বাঁদা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ। প্যারিসের এই সম্মেলনের অব্যবহিত পরে হ্যারল্ড লাস্কি, হার্বার্ট রীড (১৮৯৩-) মণ্টেগু স্ল্যাটার, ই. এম. ফর্স্টার, রজনী পাম দত্ত, সাজ্জাদ জহীর, (১৯০৫-১৯৭৩), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুলকরাজ আনন্দ (১৯০৫-) প্রমুখ ব্রিটিশ-ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা লন্ডনে এক সমাবেশে মিলিত হয়ে 'প্রগতি সাহিত্য সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের উদ্যোগে ভারতবর্ষেও অনুরূপ সংঘ গঠনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লখ্‌নৌয়ে জহরলাল নেহেরুর (১৮৮৯-১৯৬৪) সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের

অধিবেশন কালে প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা সেখানে সমবেত হন। ইতো-মধ্যে মুলকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ এবং আরও কয়েকজন মিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ১৯৩৫ সালে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র যে ইশতেহার[২৭] রচনা করেন, তা প্রকাশিত হয়। এই ইশতেহারের সূত্র ধরে ১৯৩৬ সালের ১০ই এপ্রিল মুন্‌শী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়। প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি হন মুন্‌শী প্রেমচাঁদ, আর সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর।

লখ্‌নৌ সম্মেলনের কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে প্রগতি লেখক সংঘের আঞ্চলিক শাখা গঠিত হতে থাকে। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর উদ্যোগে কলকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের বঙ্গীয় শাখার একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের ২৫শে জুন কলকাতার এ্যালবার্ট হলে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুতে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেইদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। সংঘের প্রথম সভাপতি হন ডা. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৬১-১৯৪১) 'প্রগতি লেখক সংঘের' অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ-ভাবে 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রগতিশীল সাহিত্যিক-দের একটা সংগঠন শক্তিতে পরিণত হয় এবং ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে রাখে সুদূরসঞ্চারী ভূমিকা।

ইতিহাসের এই পটে মানবজাতির সামনে নেমে আসে ফ্যাসিবাদের আরেক নগ্ন হামলা। ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুলাই ফ্রাঙ্কো, মোলা এবং অন্যান্য ফ্যাসিস্ট সেনাপতি স্পেনের প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেদিনই মাদ্রিদ বেতারকেন্দ্র থেকে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেত্রী ডলরেস ইবারুরি বিশ্বের প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক-মানবতাবাদী শক্তির কাছে ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রতিরোধ-সংগ্রামের আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের আহ্বানে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ বিপন্ন স্পেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, গড়ে তুললেন আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। পৃথিবীর প্রগতিশীল

সাহিত্যিক-শিল্পীরাও যোগ দিলেন আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে। রমাঁ রলাঁ, আরি বাঁরবুস, আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে মালরো, টেড এ্যালেন, সিডনি গর্ডন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্‌স, জন কর্নফোর্ড প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিক স্পেনের প্রজাতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রমাঁ রলাঁ পৃথিবীর সকল দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে ফ্যাসিবিরোধী জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিতিকদের এই সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্যে তিনি পাঠান নিম্নোক্ত আহ্বান :

> বর্তমান যুগের সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্বরূপ সম্বন্ধে সকলের স্পষ্ট ধারণা থাকা কর্তব্য। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ দেশের অন্যায় ও অবিচারমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা অর্জন-কল্পে নিজ শক্তিতে সংগ্রাম করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও প্রত্যেক জাতিকে অনুধাবন করিতে হইবে, ভিন্ন দেশে স্বাধীনতা দমনের প্রতিক্রিয়া অপর দেশেও প্রতিফলিত হইতে পারে। স্পেনে যাহা ঘটিতেছে, তাহা হইতে এই সত্য আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। পৃথিবীর যাবতীয় ফ্যাসিস্ট শক্তি স্পেনের জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ-চেষ্টার বিদ্রোহী জেনারেলদিগকে সাহায্য করিতেছে। ফ্যাসিস্টপন্থী তথাকথিত 'গণতন্ত্র-বাদী' দেশগুলি তাহাদের সংবাদ-পত্রে প্রচারকার্য দ্বারা, এমন কি সম্ভবতঃ অর্থ সাহায্য করিয়াও বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। তাহারা জানে, স্পেনে গণ-শক্তি পর্যুদস্ত হইলে পৃথিবীব্যাপী গণশক্তির পরাজয় ঘটিবে। স্পেনে গণশক্তির জয় ভারতের পক্ষেও মঙ্গলকর, পরাজয়ে ভারতেরও অনিষ্ট হইবে।[৩০]

একদিকে লখ্‌নৌতে প্রতিষ্ঠিত 'প্রগতি লেখক সংঘ', অন্যদিকে ফ্রাঙ্কো-ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে পৃথিবীর দেশে দেশে প্রগতিশীল মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের অগ্রণী ভূমিকা ঢাকার শিল্পী সাহিত্যিকদের আলোড়িত করে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই পূর্ববাংলার ঢাকা ও অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি মৌল পবিরবর্তন সূচিত হয়েছিল। যেমন রাজনীতি-ক্ষেত্রে, তেমনি শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ-পরিবর্তনের জোয়ার এলো। ১৯৩৯ সালেই ঢাকার কমিউনিস্ট-হিউম্যানিস্ট-প্রগতিশী

লেখকদের উদ্যোগে গঠিত হলো 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'। ঢাকার দক্ষিণ মৈশুণ্ডীর কমিউনিস্ট পাঠচক্রের 'প্রগতি পাঠাগার' যাঁরা পরিচালনা করতেন, তাঁরাই 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' সংগঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অমৃতকুমার দত্ত, সরলানন্দ সেন, জ্যোতির্ময় সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদের প্রচেষ্টায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে এই যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠল, বয়সে সকলের চেয়ে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও সোমেন চন্দই তাতে গ্রহণ করেন প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা। এই সংগঠন-সৃষ্টিতে সোমেনের উজ্জ্বল ভূমিকা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ভাষ্যে :

> ঢাকায় প্রগতি সংঘের আন্দোলন একদিক থেকে সার্থকতা লাভ করেছিল। কেননা, সোমেন চন্দের মতো একজন পুরোপুরি কমিউনিস্ট লেখককে এই সংঘ একেবারে আন্দোলনের পুরোভাগে এনে দিতে পেরেছিল। ঢাকায় সোমেন তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে প্রগতি লেখক সংঘের জেলা শাখার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৩৯ সনেই। সোমেনের দক্ষিণ মৈশুণ্ডীর বাসায় গোড়ার দিকে বেশ কয়েকটি ঘরোয়া সভা হয়েছিল।[৩১]

উৎসাহ-উদ্দীপনা-আগ্রহে, সংগঠন পরিচালনার দক্ষতায়, সাহিত্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় সোমেন চন্দ হয়ে-ওঠেন এ-সংগঠনের মধ্যমণি; তাঁরই অনুপ্রেরণায় ঢাকা শহরের প্রগতিশীল তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা এ-সংগঠনে এসে সমবেত হতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হলেও ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে গেণ্ডারিয়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকার 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' উদ্বোধন করা হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। সম্মেলনে রণেশ দাশগুপ্তকে সংগঠনের সম্পাদক এবং সোমেন চন্দকে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪১ সালের শেষদিকে সোমেন চন্দ 'প্রগতি লেখক সংঘের' সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রধানত সোমেন চন্দের উদ্যোগে 'প্রগতি লেখক সংঘ' এ-সময় কাজী আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রমুখ সাহিত্যিকের সভাপতিত্বে বেশ কয়েকটি বর্ধিতায়ন সভার আয়োজন করে সংঘের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা নেয়।

'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হলে সোমেন চন্দের কাজের পরিধি বেড়ে যায়। প্রগতি পাঠাগার পরিচালনা, ঢাকা রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ করা, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের দায়িত্ব পালন করা, রাত জেগে গল্প লেখা—সব কিছু মিলে সোমেন তখন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন। সাংগঠনিক কাজের সাথে সাথে তত্ত্বগত ভিত নির্মাণের জন্যেও এ-সময় তিনি ব্যাপক পড়ালেখা শুরু করেন। জ্ঞান চক্রবর্তীর লেখায় আছে সে-সংবাদ : "তিনি গভীর মনোযোগের সাথে মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞান এবং বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখাগুলো আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেন। এ-সময় প্রায়ই দেখা যেত সারারাত জেগে তিনি গভীর অধ্যয়নে মগ্ন আর ভোর হতেই ফোলা ফোলা লাল চোখ নিয়ে পাড়ার কাজে ব্যস্ত। একজন ম্যাট্রিক পাশ করা ছেলের পক্ষে মার্কস-লেনিনের দুরূহ বইগুলো থেকে তাঁদের তত্ত্বের মর্মবস্তু উদ্ধার করা সহজ ছিলনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ-বাধার কাছে হার মানেননি, নিজের উদ্যমেই সমস্ত কিছু আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন এবং যখন তিনি নিজে কোন প্রশ্নের সমাধান করতে পারেননি, তখন প্রধান মার্কসবাদীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছেন।"[৩২]

সপ্তাহে একবার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভা হতো। পালাক্রমে বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে বসতো সংঘের সাহিত্য-বাসর। কখনো নারিন্দায়, কখনো দক্ষিণ মৈশুণ্ডী, কখনো-বা ২০ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীট, পাটুয়াটুলি, সূত্রাপুর কিংবা গেণ্ডারিয়ায় সংঘের অধিবেশন হতো। কখনো আবার জায়গার অভাবে সংঘের নিয়মিত সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠিত হতে পারতো না। শেষের দিকে অচ্যুত গোস্বামীর বাসায় সংঘের নিয়মিত বৈঠক বসতো।[৩৩] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সভা সোমেন চন্দের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়।[৩৪] সংঘের বৈঠক ডাকা, সকলকে খবর দেয়া, কে কি পাঠ করবেন বা আলোচনা করবেন ইত্যাদি বিষয় ঠিক করা—সব কাজই সুষ্ঠুভাবে পালন করতেন সোমেন চন্দ। এ-কাজে তাঁর আগ্রহ আর আন্তরিকতার কোন অভাব নেই; কখনো তিনি ব্যস্ততার প্রসঙ্গ তোলেন নি—যদিও তিনি তখন ঢাকা রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের মুখ্য সংগঠকের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রগতি লেখক সংঘে সোমেনের উজ্জ্বল ভূমিকা তাঁরই চৈতন্যের সাথী রণেশ দাশগুপ্তের ভাষায় :

> প্রস্তুতি পর্বে সোমেন চন্দ যেমন প্রগতি লেখক সংঘের গোড়াপত্তনে অগ্রণী ছিলেন, তেমনি ১৯৪০ সালে যখন সংঘ জমজমাট হয়ে উঠলো, তখনও সোমেন চন্দ ছিলেন তার ট্রেড ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বৈঠক-গুলির সবচেয়ে নিয়মিতভাবে উপস্থিত সদস্য। আগামী বৈঠকে কারা লেখা পড়বে— এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে নির্ধারিত বৈঠকে দেখা যেতো, সোমেনের উপর লেখার ভার থাকলে তিনি ঠিক লেখা নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব নিখুঁত ভাবে পালন করতেন বলে প্রায় বৈঠকেই তাঁর উপর ভরসা করা হতো এবং তাঁকে লেখা আনতে বলা হত। এই তাগিদ একদিক দিয়ে তাঁর দিক থেকেও খুব কাজের হয়েছিল। দু'বছরের মধ্যে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি লিখেছিলেন, যেগুলি অধিকাংশই বৈঠকে পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল।[৩৫]

সোমেন চন্দ শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লেখক সংঘে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা এবং কর্মদক্ষতার জন্যে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে ট্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি লেখক সংঘেও রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ-প্রসঙ্গে সতীশ পাকড়াশী লিখেছেন, "সোমেন ··· একবার ঢাকেশ্বরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জের পাটকলে গিয়ে মজুরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু লেখক সংঘ থেকে তাকে ছাড়া যায়নি। পার্টির স্বার্থে আমরা তাকে লেখক সংঘে রাখা অপরিহার্য মনে করেছিলাম। লেখক সংঘের স্বার্থেও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বিপ্লবী সাহিত্যিকের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল।"[৩৬] এ-থেকেই পাওয়া যায় প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগঠিত করতে এবং গণমুখী সাহিত্য-সৃজনে সোমেন চন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিচয়।

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ শুধুই একটা সাহিত্যিক আড্ডা ছিল না, মানবজাতির মুক্তির সংগ্রাম ত্বরান্বিত করাই ছিল এর মৌল উদ্দেশ্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন সোমেন চন্দ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, অমৃতকুমার দত্ত, অচ্যুত গোস্বামী কিংবা আরো কেউ-কেউ ভিক্টোরিয়া পার্ক, কি বুড়িগঙ্গার তীরে বসতেন, তখন অধিকাংশ সময়ই তাঁদের কাটতো প্রগতিশীল সাহিত্য কিংবা মানবজাতির মুক্তিসংগ্রাম-বিষয়ক আলোচনায়।

তবে এই সান্ধ্য-বৈঠকে তাঁরা কখনো কখনো হাসি-ঠাট্টায়ও মেতে উঠতেন। সোমেন এ-কাজে দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাটতে তাঁর জুড়ি ছিলনা। অচ্যুত গোস্বামীর ধূসর স্মৃতির পাণ্ডুলিপি বলছে এ-কথা : "কালক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠতা শুধু বৈঠকগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। প্রতিদিনই আমরা সন্ধেবেলায় এক সঙ্গে মিলিত হতাম। সোমেন, কিরণ বাবু, অমৃতবাবু এবং আমি (অচ্যুত গোস্বামী) দিনান্তের বৈঠকের নিত্য সহচর ছিলাম এবং মাঝে মাঝে আরও অনেকে যোগদান করতেন। মনে আছে, লম্বা গল্প আলোচনা করা বা লম্বা গল্প বলাতে সোমেন খুব দক্ষ ছিলনা। কিন্তু মাঝে মাঝে দু-একটি তির্যক মন্তব্য করে সে অমৃত দত্তকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করতো। এবং সবশেষে উত্তেজিত হয়ে অমৃত আমাদের নিয়ে কোন এক রেস্তোঁরায় ঢুকতেন এবং খাবারের অর্ডার দিতেন।"[৩৭]

লেখক সংঘের কর্মীরা একটি প্রগতিশীল সাহিত্য-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন ১৯৪০সালে।[৩৮] রণেশ দাশগুপ্তের প্রস্তাবিত 'ক্রান্তি' সংকলনের নাম হিসেবে গৃহীত হয়। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলা হলো, কে কি লিখবে তা-ও ঠিক করে দেয়া হলো পূর্ব থেকেই। সোমেন চন্দের ওপর একটা গল্প লেখার দায়িত্ব পড়লো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সংঘের অনুমোদন ব্যতীত কোন রচনা প্রকাশ করা যাবে না। অনেকটা চাপে পড়েই সোমেন চন্দ তাঁর বিখ্যাত 'বনস্পতি' গল্পটি এই সংকলনের জন্য সভায় নিয়ে আসেন। সংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪০ সালের শেষের দিকে ২০ জন লেখকের রচনায় ঋদ্ধ হয়ে বেরুলো ১৬০ পৃষ্ঠার ক্রান্তি, যা পূর্ববাংলার প্রথম প্রগতিশীল সাহিত্য-সংকলন। 'ক্রান্তি'তে যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রণেশ দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন প্রমুখ। 'প্রগতি লেখক সংঘের' ঢাকা শাখার পক্ষ থেকে সোমেন চন্দ ছিলেন এই সংকলন-গ্রন্থের প্রকাশক। 'ক্রান্তি' পত্রিকা প্রেস থেকে বের করে আনতে সোমেন চন্দ দিন-রাত প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্যে সোমেন কত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৭-৮-১৯৪০ তারিখে অচ্যুত গোস্বামীর কাছে লেখা তাঁর এক চিঠির মাধ্যমে। আমরা সে-চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

সন্তান[৩৯] সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগের কোন কারণই নেই, কারণ, পিতা হয়ে আমার দায়িত্ব বড়ো কম নয়। সে যথারীতি বেড়ে উঠছে এবং ভূমিষ্ঠ-সম্ভাবনা পূর্ব-নির্ধারিত সময়েই হবে আশা করি। তাকে ভালবাসি বলে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে! দু'বেলা তো যেতে হচ্ছেই, তাছাড়া রণেশবাবুকে প্রুফ দেখানো, লেখা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। অতএব মহাশয় কেবল উদ্বেগে অধীর না হয়ে কিছু কাজের ভারও গ্রহণ করুন এসে, অমন পথে বসিয়ে পালানো চলবে না।

···কে নিয়ে মুস্কিলে পড়া গেছে, তিনি কী রকম লেখা দেন সেই ভয়ে সবিশেষ চিন্তিত আছি। আপনি যতজন সাহিত্যিকের বাড়ী পারেন **Raid** করে আসবেন এবং আমাদের সন্তান-সম্ভাবনাকে সবিস্তারে জানিয়ে আসবেন। হীরেন মুখার্জী এবং সুরেন গোস্বামীর ঠিকানা যে-কোন উপায়ে সংগ্রহ করে তাঁদের সংগে আলাপ করে আসতে পারলে ভালো হয়।[৪০]

'ক্রান্তি' প্রকাশিত হলে ঢাকার তরুণ লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ সাড়া পরে যায় এবং কয়েকজন প্রতিশ্রুতিময় লেখক 'প্রগতি লেখক সংঘে' যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জীবন চক্রবর্তী এবং রণেন মজুমদার। 'ক্রান্তি'-র সংবাদ যাতে কলকাতায় পৌঁছে, সে-উদ্দেশ্যে প্রায় শ'খানেক 'ক্রান্তি' নিয়ে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে সোমেন কলকাতা যান এবং সেখানকার লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গ্রন্থটি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ক্রান্তি' দেখে কলকাতার প্রগতি-শীল সাহিত্য-শিল্পী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। একটি মফঃস্বল শহরের কয়েকজন সম্ভাবনাময় অথচ অজ্ঞাত তরুণের রচনায় ঋদ্ধ হয়ে এই রকম প্রগতিশীল জীবনভাবনা-পুষ্ট একটি সংকলন প্রকাশ করা ছিল এক শ্রমসাধ্য দুরূহ কাজ। তাই কলকাতার 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান এবং অতঃপর উভয় বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। 'ক্রান্তি'-সূত্রেই কলকাতা থেকে বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক ঢাকা এসেছিলেন[৪১] এবং এ-ক্ষেত্রেও সোমেন পালন করেন সেতুবন্ধকের ভূমিকা।

১৯৪০ সালে সোমেন যখন 'ক্রান্তি' নিয়ে কলকাতা যান, তখন 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে তিনি 'ইঁদুর' গল্পটি 'পরিচয়'-সম্পাদকের কাছে দিয়ে আসেন। সোমেনের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই 'পরিচয়' পত্রিকায় 'ইঁদুর' প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।[৪২] মোপাসাঁর 'ব্যুল দ্য সুইফ', গোর্কির 'মাকার চুদ্রা' কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসীমামী'—এক একটি গল্প যেমন এক একজনকে সাহিত্যিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে, সোমেন চন্দের সাহিত্যিক-জীবনের ক্ষেত্রে তেমনি 'ইঁদুর'।

'ক্রান্তি' নিয়ে কলকাতা যাবার প্রায় বছর দুয়েক পূর্বে ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে সোমেন একবার কলকাতা যান, সেই তাঁর প্রথম কলকাতা যাওয়া।[৪৩] কলকাতা-সম্পর্কে ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের কৌতূহল, এবার চোখের সামনে কল্লোলিত সেই কলকাতা। বাংলা ভাষায় যাঁদের লেখা এতদিন তিনি ছাপার অক্ষরে পড়েছেন, তাঁরা প্রায় অনেকেই থাকেন কলকাতায়; অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো—স্বপ্নিল দৃষ্টি নিয়ে সোমেন বাংলার সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরে পা রাখলেন। এ-পর্বে তিনি কলকাতা ছিলেন মাত্র একমাস। কিন্তু এই একমাসেই তাঁর অভিজ্ঞতার আধার হয়েছে অনেক ঋদ্ধ। কলকাতায় এসেছিলেন তিনি 'বালিগঞ্জ'-'অগ্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক নির্মলচন্দ্র ঘোষের আমন্ত্রণে, এবং কলকাতায় এসে তিনি উঠেছিলেন শ্রী ঘোষের বাড়িতেই। তাই এ-প্রসঙ্গে নির্মলচন্দ্র ঘোষের আবছায়া স্মৃতির শরণ:

> তারপর চল্‌লো একমাস ধরে তার (সোমেন চন্দ) তীর্থ-পরিক্রমা। আর এদিকে বেঁচে থাকবার সমিধ-সংগ্রামের প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে সন্ধ্যার দিকে ফিরতাম ঘরে। অস্তোন্মুখ সূর্যের রশ্মিচ্ছটায় তখন কলকাতার আকাশ পরিব্যাপ্ত, পূর্বাচলের পথে রাতের অন্ধকার আসছে নেমে। প্রত্যহই দেখতাম জানালার পাশে বসে সোমেন্দ্র ধূলিমলিন রাজপথের জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে। তার সে তাকাবার ভঙ্গি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।[৪৪]

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে ঢাকায় শুরু হয় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মানুষ হত্যা করছে মানুষকে, দিন-দুপুরেও রাজপথ জনশূন্য,

ঘরেও মানুষ শঙ্কিত——কিন্তু বিশ বছরের এক তরুণের চোখে ঘুম নেই, মনে নেই শঙ্কা, নেই এক-পল সময়ের বিশ্রাম। মহান এই তরুণ, সোমেন চন্দ, ঢাকার রাজপথ থেকে রাজপথে, গলি থেকে গলিতে বন্ধু রণেশ দাশ-গুপ্তকে নিয়ে ঘুরে ফিরছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ-কল্পে, শুনাচ্ছেন সকলকে মানব-মৈত্রীর গান আর মানুষকে ভালোবাসার কথা। সাম্প্রদায়িক এই দাঙ্গা রাজনৈতিক-কর্মী সোমেনের চিত্ততলে আলোড়ন তুলেছিল, তিনি ব্যথিত হয়েছেন——আর তারই প্রকাশ ঘটেছে দিনে কোন-এক কমল-কি কামালের রক্তে-ভেজা হাত দিয়ে রাত-জেগে লেখা অসামান্য গল্প-'দাঙ্গা'য়। অচ্যুত গোস্বামীর স্মৃতি অনুধাবনীয় :

> ঢাকায় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। ঢাকায় এ রকম দাঙ্গা অনেকবার হয়েছে; এবং দাঙ্গার অবস্থায় আমরা নিজেদের সবচেয়ে অসহায় এবং নিঃসহায় বলে বোধ করতাম। জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারতামনা, আমাদের শুভবুদ্ধিমূলক প্রচারে কান-দেওয়ার মত সুস্থ মানসিক অবস্থায় তখন জনসাধারণ থাকত না। সেই সময় আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হয়েছিল যে দাঙ্গার উপর সার্থক প্রগতিশীল গল্প লিখিত হওয়া উচিত। দু-তিনটি গল্প লেখাও হয়েছিল; কিন্তু সেগুলো আমাদের কারুরই তেমন মনঃপুত হয়নি। কারণ সেগুলি সবই মোটামুটি প্রত্যাশিত লাইনে লেখা হয়েছিল।··· হঠাৎ একদিন সোমেন সংঘের বৈঠকে একটি গল্প পড়ে শোনাল। বোধকরি সেই প্রথম সে একটি গল্প পাঠ করে আমাদের শোনাল। গল্পটির নাম 'দাঙ্গা'। আমরা হাসি হাসি মুখ নিয়ে গল্পটি শুনতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ছোট্ট গল্পটি পড়া শেষ হয়ে গেলে আমরা সকলে থ' হয়ে গেলাম। আমাদের সমালোচক চূড়ামণি রণেশবাবু পর্যন্ত চুপ করে থেকে মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন: 'একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর গল্প; কোন খুঁত বের করার উপায় নেই।' আজও আমার ধারণা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দাঙ্গার উপর এইটিই একমাত্র সার্থক গল্প।[৪৫]

সোমেন চন্দ ১৫ / ১৬ বছর বয়স থেকেই গল্প-কবিতা লিখতেন, কখনো তা স্থান পেতো হাতে-লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে, কখনো পড়ে থাকতো

তার বিছানার নীচে। সোমেন ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির, তাই নিজের লেখা সচরাচর কোথাও ছাপতে দিতেন না। 'দাঙ্গা'র মতো বিখ্যাত গল্প-টিও তিনি প্রকাশের জন্যে কোথাও পাঠাননি।[৪৬] লেখা ছাপা হলেও তিনি বন্ধুদের বলতেন না। সোমেনের বন্ধু সনীন্দ্রকুমার হোরের স্মৃতি স্মরণীয়: "খুব সম্ভব ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হবে। একদিন খুব সকালে সোমেনের বাসার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সোমেন বাইরে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ ডাক দেওয়ায় সাইকেল থেকে নামতে হোল।···এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি কতকগুলো দরখাস্তের ওপর একখানা 'প্রভাতী' পত্রিকা পড়ে রয়েছে। ···উল্টিয়ে দেখি তার লেখা একটা গল্প। আমি বললাম, 'তুমি তো আচ্ছা লোক, এতক্ষণ আমাকে বলইনি যে তোমার লেখা এতে আছে।' এত ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক হয়েও সে এক ঝাপটা মেরে আমার হাত থেকে কাগজ-খানা কেড়ে নিতে চেষ্টা করলো। ওর এটা একটা স্বভাব ছিল—কাউকে সহজে লেখা দেখাতে চাইতো না।"[৪৭] অচ্যুত গোস্বামীর ভাষ্য অনুযায়ী[৪৮] আঠার বছর বয়সের মধ্যে সোমেন 'অজস্র গল্প' এবং 'অন্তত দুখানি' উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই লেখার অনেক কিছুই আজ কালস্রোতে হারিয়ে গেছে। এজন্যে সোমেনের মানস-প্রবণতাও কম দায়ী নয়। সোমেনের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্টভাবে মিশেছেন, তাঁদেরও তিনি নিজের লেখার কথা বলতেন না লজ্জা ও সংকোচে। বার্নার্ড শ'-র কৈশোরক লেখার মতোই এগুলোকে তিনি 'Non-age' লেখা বলে মনে করতেন।

সমসাময়িককালে ঢাকা থেকে ৬/৭ টি সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বের হতো। সোমেন এ-সব পত্রিকায় মাঝে মাঝে লেখা পাঠাতেন, কখনো তা ছাপাও হতো। ১৯৩৭ সাল থেকে যে-সব পত্রিকায় সোমেনের লেখা[৪৯] প্রকাশিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, সেগুলো হলো :

ক. ঢাকা : প্রভাতী (১৯৩৬), সোনার বাংলা (১৯৩৬), শান্তি (১৯৩৬), ক্রান্তি (১৯৪১), প্রতিরোধ (১৯৪২)

খ. সিলেট : বলাকা (১৯৩৭)

গ. কলকাতা : দেশ (১৯৩৯), অরণি (১৯৪১), জনযুদ্ধ (১৯৪২), সবুজ বাংলার কথা (১৯৩৮), অগ্রগতি (১৯৩৮),

নবশক্তি (১৯৩৯) বালিগঞ্জ (১৯৩৯), পরিচয় (১৯৪২) আনন্দবাজার (১৯৩৮) ইত্যাদি।

'আনন্দবাজার' পত্রিকায় তাঁর লেখা একটা একাংকিকা গৃহীত হয়েছিল বলে 'সবুজ বাংলার কথা'-র সম্পাদক জানিয়েছেন, কিন্তু লেখাটি পরবর্তী কালে আর প্রকাশিত হয়নি।[৫০] মাঘ ১৩৪৬ থেকে মাঘ ১৩৪৭—এই এক বছরে 'বালিগঞ্জ' পত্রিকার যে এগারটি সংখ্যা বের হয়, তাতে ধারাবাহিকভাবে প্রতি সংখ্যায় সোমেন চন্দের এ-যাবত পাওয়া একমাত্র উপন্যাস 'বন্যা'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'বন্যা'-র লেখক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হতো 'সোমেন্দ্রকুমার চন্দ'। সোমেন চন্দ 'বালিগঞ্জ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গান' ও 'প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প দুটি 'ইন্দ্রকুমার সোম'—এই ছদ্মনামে লেখেন। এ-প্রসঙ্গে 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ'-এর সম্পাদক দিলীপ মজুমদার লিখেছেন, "এক সাক্ষাৎকারে শ্রী নির্মলকুমার ঘোষ আমাকে বলেছেন যে, তিনিই সোমেনের পিতৃদত্ত নামকে একটু অদল-বদল করে এই ছদ্মনাম গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। হয়তো প্রতিসংখ্যায় সোমেনের উপন্যাস প্রকাশিত হতো বলেই এই ছদ্মনাম গ্রহণের প্রশ্ন এসেছিল।"[৫১]

এই উজ্জ্বল-কর্মচঞ্চল রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক-জীবন অতিক্রম করে, দ্রোহী তরুণ সোমেন চন্দ একদিন পা রাখলেন ইতিহাসের এক অরুন্তুদ অথচ গৌরবোজ্জ্বল বিন্দুতে। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ। 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' ঢাকার সুত্রাকল শ্রমিকদের সহায়তায় এদিন সূত্রাপুরের সেবাশ্রম মাঠে ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা হতে দুপুর থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল করে শ্রমিকেরা সম্মেলনে এসে যোগ দিতে থাকে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী। এছাড়াও, সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রমিক নেতা শামসুল হুদা, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, জ্যোতি বসু, সাধন গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ।

সোভিয়েত-ভূমি হিটলার-বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে ভারতসহ পৃথিবীর মানবতাবাদী প্রগতিশীল মানুষ ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনকে রুখবার জন্যে জন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষের উগ্র জাতীয়তাবাদী আর. এস.

পি.; ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি রাজনৈতিক দল সোভিয়েতের পক্ষে না থেকে বরং ফ্যাসিস্ট জার্মান-ইতালি-জাপানকে সমর্থন জানাতে থাকে সুভাষ বোসের নেতৃত্বে। এ-পটভূমিতে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের বিরোধ চরমে পৌঁছে। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চের ঢাকার ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনটি মার্কসবাদীদের কাছে ছিল তাই একটা চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণ সোমেন চন্দ প্রথম থেকেই অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন, সম্মেলন সফল করার জন্যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন খাওয়া ঘুম-বিশ্রামের কথা। কর্মদক্ষতা, শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা এবং ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্যে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি. প্রভৃতি উগ্র জাতীয়তাবাদী গ্রুপগুলোর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ান; তারা নির্ভুলভাবেই সোমেনকে আক্রমণের জন্যে বেছে নেয়।

রবিবার। ৮ই মার্চ। ১৯৪২ সাল। ফাল্গুন ২৪, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। ঢাকার সূর্য তখন ৩টার আকাশে। সমগ্র ঢাকা শহর ফ্যাসিস্টবিরোধী ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে মুখরিত। ঢাকার কেন্দ্রীয় রেল-স্টেশন ফুলবাড়িয়া থেকে রেলওয়ে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়ে সোমেন জীবনের শেষ মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন নবাবপুর রোড ধরে। হাতে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা, মুখে তাঁর হয়তো এমন কোন বজ্রধ্বনি—'ফ্যাসিবাদ-নাজিবাদ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক'। সূত্রাপুরের সম্মেলন স্থলে যাবার জন্যে মিছিল লক্ষ্মীবাজারের কাছে গিয়ে বামদিকের হৃষীকেশ দাস রোডে ঢুকল। ইতোমধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী দলসমূহ সম্মেলন-মণ্ডপ হামলা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্জয় প্রতিরোধের মুখে, পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে অখিল দাস নামের তাদেরই একজন সমর্থক। জাতীয়তাবাদী-দের একটি দল যখন সূত্রাপুর থেকে ফিরে আসছিল, তখন সোমেন তাদের সামনে পড়লেন। ফ্যাসিস্ট-সমর্থকেরা এতদিনের সবচেয়ে বড় শত্রুকে হাতের কাছে পেয়েছে। সোমেনকে কিছু বুঝতে দেয়ার আগেই রড, ভোজালি ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে আঘাত করতে লাগলো। হঠাৎ আক্রমণের মুখে পড়ে সোমেন পালিয়ে যায়নি, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে; এক সময় যখন বুঝেছে তাঁর সময় শেষ, তখন কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকাটা বুকের রক্তে আরো রক্তিম করে তুলে ধরেছে উঁচুতে, শেষ নিঃশ্বাস পড়ার পূর্ব-মুহূর্তেও তিনি পতাকাটা মাটিতে পড়তে দেননি—পার্টি-পতাকার প্রতি

এমনি ছিল আনুগত্য কমিউনিস্ট সোমেনের। এভাবে একুশ-বসন্ত পাড়-হওয়া এক বিপ্লবী যোদ্ধার, এক কমিউনিস্ট সাহিত্যিকের, এক মানবদরদী কর্মীর জীবন-সূর্য অকালে অস্তমিত হলো। স্পেনে ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে কমিউনিস্ট-সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্স যেমন আন্দালুসিয়ার লোপেরা গ্রামের মাটি বুকের রক্তে রক্তিম করেছিল, ক্রিস্টোফার কডওয়েল যেমন স্পেনের জারামা নদীর নীল জল বুকের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিল কিংবা জন কর্নফোর্ড যেমন কর্ডোভার নিসর্গকে হৃদপিণ্ডের রক্তে লাল করে দিয়েছিল; তেমনি, তাঁদেরই চৈতন্যের সহোদর, বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্যিক শহীদ, সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকার রাজপথ বুকের রক্তে রক্তিম করেছে—স্পেনের রক্ত-স্রোতের সাথে ঢাকার রক্তস্রোতের ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঁদের মতোই বীরের মৃত্যু বরণ করেছে আর অনাগত উত্তরসূরির কাছে রেখে গেছে সংগ্রাম আর বিপ্লবের জন্যে অমরতার সমান একগুচ্ছ সূর্যকরোজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।

সোমেন চন্দকে কিভাবে হত্যা করেছে ফ্যাসিস্টশক্তির সমর্থকরা? কত নির্মমভাবে তাঁকে আঘাত করেছে ফরোয়ার্ড ব্লক আর আর. এস. পি.-র ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা। সমকালের প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তীর স্মৃতিতে সেই ভয়াল তাণ্ডব আর পাশবিকতা:

> মার্কসবাদীদের সাথে জাতীয়তাবাদীদের দ্বন্দ্ব যখন খুবই উত্তেজনা-কর অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, তখন ৪২ সালের ৮ই মার্চ মার্কস-বাদীরা ঢাকা জেলার ফ্যাসীবিরোধী কর্মী সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন।...বেলা আড়াইটার সময় রক্তপতাকা হাতে সোমেন চন্দ রেল-শ্রমিকদের একটি দল নিয়ে ঢাকা রেলওয়ে কলোনী থেকে রওনা হন সম্মেলনে যোগদানের জন্য। প্রায় ৩টার সময় এ শোভাযাত্রাটি শ্লোগান দিতে দিতে যখন লক্ষ্মীবাজার হৃষী-কেষ দাস রোডের মোড়ে এসে পৌঁছে, তখন ছোরা, ভোজালি, লোহার ডাণ্ডা এসব মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে একদল লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপরে। অতর্কিতে আক্রমণের ফলে শোভাযাত্রাটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তখন এরা বেছে নেয় সোমেনকে। ভোজালি দিয়ে পর পর আঘাত করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয়, চোখ দুটি উপরে ফেলে, জিভ টেনে বের করে তা কেটে ফেলে দেয়, পেট চিরে

নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয় এবং অট্টহাস্য করে পশুর মত তারা তাঁর ছিন্ন ভিন্ন দেহের ওপর নাচতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল, সোমেন শ্লোগানের পর শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্তও রক্তপতাকা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। এভাবেই শহীদ সোমেন চন্দ সাহসের সাথে মৃত্যুবরণ করেন নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।[৫২]

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'প্রতিরোধ' পত্রিকায় (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) 'প্রত্যক্ষদর্শী' ছদ্মনামে সরলানন্দ সেনের[৫৩] "২৪ শে ফাল্গুন" শীর্ষক প্রবন্ধে সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ আছে এ-রকম, "···বিস্তৃত বিবরণ শুনিবার কোন ইচ্ছা ছিল না, তবু শুনিতে হইল। সভা-ভঙ্গের উদ্দেশ্যে যাহারা আসিয়াছিল, সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকদের সময় মত প্রতিরোধে তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিল না। অধিকন্তু গুণ্ডামীর মূল্যস্বরূপ একটি তরুণ জীবনকে (অখিল দাস) পুলিশের গুলির ঝাছে আহুতি দিতে হইল। দুইটি ব্যাপারে তাহারা প্রতিহিংসা লইবার জন্য ক্ষেপিয়া গেল। এমনি সময় এই হিংস্র জনতার মুখে আসিয়া পড়িল সোমেন। একদল রেলওয়ে শ্রমিকের মিছিল লইয়া অত্যন্ত অসময়ে সে আসিতেছিল। দূর হইতেই লাল ঝাণ্ডা হাতে অত্যন্ত অল্প-বয়সী দ্রুত গতিশীল একটি মূর্তি দেখিয়াই আক্রমণকারীরা উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহাদের কৌশলে সোমেনের অনুবর্তীরা মিথ্যা রটনায় বিচলিত হইয়া সরিয়া পড়িল। আততায়ীরা এইবার তাহাদের প্রতিহিংসা পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করার সুযোগ পাইল। নাতিক্ষুদ্র দলটি সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত শ্রমিক-সাহিত্যিককে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর যাহা ঘটিল অত বড় মহা-ভারতের মধ্যে একমাত্র অভিমন্যুবধেই তাহার নজির মেলে। ···সোমেনকে শেষ দেখিয়াছিলাম শব-পরীক্ষাগারে। পুরনো কোঠাটা রক্তে ভরিয়া গিয়াছে; রক্ত আসিয়া জমিয়াছে বাইরের সিঁড়ির উপর। শেষবারের মত দেখিলাম সোমেনের মৃত বাহু এখনো আগের মতই সুডোল রহিয়াছে; প্রশস্ত বক্ষ এখনো সংকুচিত হয় নাই; স্থির চোখের ভিতর বিপ্লবীর দাহিকাশক্তি তখনো নিভিয়া যায় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, অমন নিটোল সুপুষ্ট শরীরটা আঘাতের পর আঘাতে কী বীভৎসই না দেখাইতেছে।"[৫৪]

এভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের হাতে এক মহান সাহিত্যিক এবং কমিউনিস্ট কর্মী সোমেন চন্দ, মাত্র বাইশ বছর বয়সে নিহত হন। যিনি ছিলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে, তিনি নিহত হলেন ফ্যাসিস্টদেরই হাতে। সোমেনের এই অকাল মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয় আরেক মহান সাহিত্যিক সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) কথা, সোমেন যেন সুকান্তের সহোদর। জীবন-রাজনীতি আর সাহিত্যকে এঁরা দু'জনে যেন মিলিয়েছেন পার্বতী-পরমেশ্বরের ঐকান্তিকতার।

সোমেনের হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের করে তোলে আলোড়িত-বিক্ষুব্ধ, বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে প্রতিবাদ-সভা। এই হত্যার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, প্রতিবাদের সাংবাদিকরাও হয়ে ওঠেন সোচ্চার।[৫৫] বিভিন্ন প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এই ঘটনায় তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে। শিল্পীসাহিত্যিকরা পত্রিকায় বিবৃতি পাঠিয়ে প্রকাশ করেন তাঁদের ক্ষোভ। ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকরা পত্রিকায় এই হত্যার প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন—প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হিরণকুমার স্যান্যাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সরোজ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

> সম্প্রতি ঢাকা হইতে এক মর্মান্তিক সংবাদ আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ যখন শ্রমিকদিগের একটি শোভাযাত্রা লইয়া ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে যাইতেছিল, তখন তাহাকে নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। আমরা জানি যে, শ্রীযুক্ত চন্দ মার্কসবাদী আন্দোলন এবং জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। লেখক হিসেবে ন্যায়তঃ এবং স্বভাবতঃ তিনি যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী হইবেন তাহাতে সন্দেহের কিছুই নাই।...সোমেন চন্দ

> একজন উদীয়মান ও বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি যে মাত্র লেখক ছিলেন তাহা নয়, তিনি তাঁহার নিজের চিন্তা-ধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুরূপ ভাবে দেশের ও দশের সেবায় যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার প্রকৃতির উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে।··· ফ্যাসিস্টবিরোধী দল সংগঠন করিতে সোমেন চন্দ যে অগ্রসর হইবেন ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকিতে পারেনা ।···আমাদের একজন নির্ভীক সহকর্মীর মৃত্যুতে আমরা সন্তপ্তচিত্তে দেশের জনসাধারণের নিকটে এই রক্তলিপসা এবং বিষকলুষ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে একবাক্যে তীব্র-ঘৃণা জ্ঞাপন করিতে আবেদন জানাইতেছি।[৫৬]

সোমেন চন্দের মৃত্যুতে বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী-সমাজ কিভাবে প্রতিবাদমুখর হয়েছিল, তা আমরা 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামক সংগঠনটির গঠনের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি। ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ গঠনের পশ্চাতে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ এবং ভারতের উপর জাপানের হামলা ছিল পরোক্ষ কারণ; কিন্তু তাৎক্ষণিক এবং প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল সোমেন চন্দের হত্যাজনিত প্রতিবাদ-সম্ভব প্রতিক্রিয়া।[৫৭] এ-প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় দাসের মন্তব্য উদ্ধরণীয়:

> ইতিহাসের ···তাৎপর্যময় মুহূর্তে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী এক মিছিল পরিচালনা করার সময় ঢাকার তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দ নিহত হন ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের হাতে।···সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে ওঠেন বাংলার সকল দলের সর্বমতের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। এমন কি বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীর মতো দল-নিরপেক্ষ লেখকও এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে সেদিন বিবৃতি প্রকাশ করেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে মানবিকতার বিবেক, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ যেন একটা ঐক্যসূত্র খুঁজে পেলেন। এই সূত্র ধরেই ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সম্মেলন এবং এই সম্মেলন মঞ্চেই গঠিত হয় 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পসংঘ'।[৫৮]

এ-প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশের মন্তব্যও স্মরণীয়—"এতদিন বাংলাদেশের সংঘের নাম ছিল 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এটি

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'নিখিল ভারত গণনাট্য সংঘ' উভয়েরই বাংলা শাখা। কেন্দ্র ও শাখার নামের এই বৈষম্যের কারণ—১৯৪২ সালের মার্চ মাসে যখন বাংলাদেশে জাপানী আক্রমণ প্রায় আসন্ন হয়ে ওঠে ও দেশী ফ্যাসিস্টদের হাতে সোমেন চন্দ নিহত হন তখন সেই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে বাংলা শাখার উদ্ভব। সংঘের 'ফ্যাসিস্টবিরোধী' আখ্যার যৌক্তিকতা এইখানেই।"[৫৯] ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘের জন্মের ইতিহাস বলতে গিয়ে চিন্মোহন সেহানবীশ '৪৬ নং' শীর্ষক পুস্তিকায় লিখেছেন :

> ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘের জন্ম ১৯৪২ সালে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের একটি শাখা ছিল বাংলাদেশে। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুন ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল একেবারেই। যে-ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে তার পুনরুজ্জীবন ঘটল, সেটি হচ্ছে দেশী ফ্যাসিস্ট-ঘাতকদের হাতে ঢাকার তরুণ লেখক সোমেন চন্দের অপমৃত্যু (৮ই মার্চ, ১৯৪২)। ঐ মৃত্যু সেদিন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বাঙালী লেখকদের।[৬০]

সোমেনের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র-সমাজও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শোকসভা ছাড়াও, তারা সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে সোমেনের স্মৃতি ধরে রাখতে চায়। এই প্রয়াসের ফলেই প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় ফ্যাসিস্টবিরোধী কবিতার প্রথম সংকলন 'প্রাচীর' (১৯৪২)।[৬১] সোমেন চন্দের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত এই সংকলনে কবিতা লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রমুখ কবি। এ-প্রসঙ্গে লীলা রায়ের মন্তব্য স্মরণীয় :[৬২]

> The tragic death in last March of Somen Chanda, a promising young leftist writer, has aroused indignation and regret in literary circles here....Leftist writers held a conference in Calcutta at which they sought to consolidate anti-Fascist forces and a book of poems dedicated to the memory of their colleague resulted. Amiya Chakravarty, Buddhadeva Bose, Bishnu Dey, Samar Sen and Subhas Mukherjee are among the

contributors. The book takes its name 'prachir' (The Barricade) from the spirited chorus of the opening poem by Amiya Chakravarty :

We build barricades।
    Let the spirit's sword
    Stay the destroyers!
Take up the song—
    Not a blackshirt shall remain,
        no, no!

বুদ্ধদেব বসুর মতো 'প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি-নিরপেক্ষ' কবিও সোমেনের মৃত্যুতে বিচলিত হয়েছেন এবং 'প্রাচীর' সংকলনে প্রকাশিত 'প্রতিবাদ' শীর্ষক এক কবিতায় উচ্চারণ করেছেন এই অসামান্য উদ্দীপিত চরণগুচ্ছ :[৬৩]

রাজপথে স্তূপীকৃত গ্রন্থাবলী দিয়ে সাজায়ে নারকী চিতা সভ্যতার
                                        শবদাহ করে,
    ধ্বংস করে বিদ্যালয়, বিদ্যার্থীর
                    রক্তে করে স্নান।
    যারা প্রাতঃস্মরণীয়, যারা মহাপ্রাণ
    কবি যাঁরা শিল্পী যাঁরা
                জ্ঞানী যাঁরা
    অরাজক অন্ধকারে একমাত্র
                আলোর ইশারা,
    অত্যাচারে অপমানে নির্বাসনে
    রক্ত চক্ষু শাসনে ত্রাসনে
তাদের বিনাশ এর পৈশাচিক ব্রত।···

পশুত্বের প্রতিবাদে লিখানে রেখাবে
                আজ হোক উদ্দীপিত
    আমার কবিতা।

সোমেন চন্দের উজ্জ্বল কর্মময় জীবন নিয়ে সমকালে গানও রচিত হয়েছে। চল্লিশের দশকে ফ্যাসিস্টবিরোধী জনমত গড়ে তোলার জন্যে সাধন দাশ-গুপ্ত নামক একজন গীতিকার সোমেনের জীবন নিয়ে গণসঙ্গীত রচনা করেছেন।[৬৪] অমৃতকুমার দত্ত সোমেনের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি পাতা' (১৯৪৩)। বর্তমান কালেও, সময়ের ব্যবধান অতিক্রম করে, সোমেন সৃষ্টিশীল লেখকদের কাছে হয়ে-ওঠেন প্রেরণার এক জ্বলজ্বলে ধ্রুবতারা; নিজেই কখনো-বা হয়ে যান উপন্যাসের কোন প্রধান চরিত্র।[৬৫] ঢাকার ২০ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীট থেকে অচ্যুত গোস্বামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত ১৩৫০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রতিরোধ'[৬৬] পত্রিকা সোমেন চন্দের স্মৃতিকে ধরে রাখার একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। সোমেনের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত এই সংখ্যায় সোমেনের সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের নানা প্রান্ত আলোচিত হয়েছে। সোমেন চন্দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে পরবর্তীকালে ঢাকা ও কলকাতায় স্থাপিত হয় 'সোমেন স্মৃতি পাঠাগার' এবং প্রতি বছর ৮ই মার্চ পালিত হতো 'সোমেন স্মৃতি দিবস'।[৬৭] এভাবে মৃত্যুর পরেও মৃত্যুহীন প্রাণ সোমেন চন্দ প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাহিত্যিক কর্মীদের মাঝে নিয়ত সঞ্চার করতে থাকেন সাহস আর সংগ্রামের একগুচ্ছ দীপ্ত অনুপ্রেরণা। বন্ধু কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের স্মৃতির রেখায় আছে এ-প্রসঙ্গে কিছু কথা :

> সোমেনের মৃত্যুর সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মনে পড়ে সোমেনের শবদেহ যখন মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন আরো অনেকের সঙ্গে সঙ্গী হয়েছেন বঙ্কিম মুখার্জী ও জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসু শ্মশানে আমার পাশেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আর তাঁর পাশেই চিরকালের বিপ্লবী ঢাকার রণেশ দাশগুপ্ত। শ্মশান যাত্রীদের মধ্যেই কে একজন যেন ছুরির ফলা দিয়ে দেয়ালে লিখেছিলেন, "সোমেন চন্দ : আমাদের প্রিয় সংগ্রামী লেখক।" তখন যুদ্ধের দরুন ব্ল্যাক-আউট চলছে, ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো অন্ধকার, অন্ধকার নীলিমায় নক্ষত্রের মালা। সোমেনের শেষকৃত্য সমাধা হবার পর সবাই ফিরে এলেন জীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকতর দৃঢ়তা ও প্রত্যয় নিয়ে।[৬৮]

কেবল সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নয়, বাংলার প্রগতিশীল রাজনীতি-বিদদেরও সোমেন চন্দ তাঁর মহান মৃত্যু দিয়ে আলোড়িত করেছিলেন। পরবর্তীকালে, অনেক বিপ্লবী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকথায় সোমেন চন্দের উজ্জ্বল অবদান উল্লেখিত হয়েছে।[৬৯] পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের বিকাশধারা-বিশ্লেষণেও সোমেন চন্দ আছেন স্বমহিমায় উপস্থিত।[৭০] সমকালীন মুসলিম মধ্যবিত্তের চেতনালোকেও সোমেন চন্দ হয়ে-উঠেছিলেন সাহস আর অনুপ্রেরণার অনির্বাণ উৎস। এ-প্রসঙ্গে সরদার ফজলুল করিমের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়:

ক. ১৯৪২-এ বিপ্লবী সাহিত্যিক সোমেন চন্দের নিহত হওয়ার ঘটনা দ্বারাও আলোড়িত হয়েছি।...সোমেনের নাম যে সেদিনের মুসলমান ছাত্র-সম্প্রদায়ের আমি এবং কতিপয় আমরা শুনেছিলাম এবং সে-ঘটনা দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলাম এটি আমাদের সৌভাগ্য। ...সোমেনের আত্মদানের ঢেউ আমাদেরকেও স্পর্শ করেছিল, আলোড়িত করেছিল।...সোমেনের কাছে আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, সোমেন তাঁর নতুন পথের যাত্রায় আমাদের শরীক করেছিলেন; জীবন ও সমাজ-চেতনায় নতুন একটি পর্যায়ের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন।[৭১]

খ. ...বামপন্থীদের ব্যাখ্যার ভিন্নতা আর আত্মকলহে এক উগ্র উপ-দলের হাতে সেদিনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হলেন। তার নিহত হওয়ার ঘটনাও তাৎক্ষণিক ভাবে আমরা জানিনি। তবু সোমেনের জীবনের আদর্শ ও তার আত্মত্যাগের কাহিনী কালক্রমে আমাদেরকে, মানে, আমাকে, সৈয়দ নূরুদ্দিনকে, সানাউল হককে, মুনীর চৌধুরীকে, আবদুল মতিনকে টেনে এনেছিল ঢাকার প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের সংস্পর্শে ও তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে।[৭২]

মাত্র পাঁচ বছরের সাহিত্যিক-জীবনে গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সোমেন চন্দের সৃষ্টিসম্ভার যথেষ্ট ঋদ্ধ। কিন্তু তাঁর রচনার অধিকাংশই অসতর্কতা এবং প্রযত্নের অভাবে হারিয়ে গেছে; সাময়িকীর পত্রালি থেকে অনেক লেখা আজো গ্রথিত হয়নি। সোমেন চন্দের দু'টো গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর

মাসে ঢাকার প্রতিরোধ পাবলিশার্স প্রকাশ করে তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন "সংকেত ও অন্যান্য গল্প"। এই গল্প-গ্রন্থে সংকলিত হয় ছ'টি গল্প—'রাত্রিশেষ', 'স্বপ্ন', 'একটি রাত', 'সংকেত', 'দাংগা' এবং 'ইঁদুর'। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর কলকাতার মডার্ন পাবলিশার্স প্রকাশ করে সোমেন চন্দের দ্বিতীয় গল্প-গ্রন্থ "বনস্পতি"। "বনস্পতি"-তে সংকলিত হয় ১১টি গল্প—'মরুদ্যান', 'ভালো না-লাগার শেষ', 'অমিল', 'সত্যবতীর বিদায়', 'সিগারেট', 'গান', 'প্রত্যাবর্তন', 'অকল্পিত', 'মহাপ্রয়াণ', 'প্রান্তর' ও 'বনস্পতি'। গল্প-সংকলন দুয়ে যে ১৭টি গল্প স্থান পেয়েছে, সে-গুলোর প্রথম প্রকাশ-উৎস নিম্নরূপ :

গল্পের নাম	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল
রাত্রিশেষ	(জানা যায়নি)	(জানা যায়নি)
স্বপ্ন	রবিবাসরীয় 'আনন্দবাজার'	১৯৩৮
একটি রাত	(জানা যায়নি)	(জানা যায়নি)
সংকেত	রবিবাসরীয় 'আনন্দবাজার'	১৯৩৮
দাংগা *	পাক্ষিক 'প্রতিরোধ'	১৯৪২
ইঁদুর *	মাসিক 'পরিচয়'	১৯৪২
মরুদ্যান	মাসিক 'প্রভাতী'	১৯৩৯
ভালো না-লাগার শেষ	সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি'	১৯৩৭
অমিল[১৩]	পাক্ষিক 'সবুজ বাংলার কথা'	১৯৩৮
সত্যবতীর বিদায়	মাসিক 'শান্তি'	১৯৩৮
সিগারেট	মাসিক 'শান্তি'	১৯৩৯
গান	(জানা যায়নি)	(জানা যায়নি)
অকল্পিত*	পাক্ষিক 'প্রতিরোধ'	১৯৪২
প্রত্যাবর্তন	(জানা যায়নি)	(জানা যায়নি)
মহাপ্রয়াণ	মাসিক 'বালিগঞ্জ'	১৯৪০
প্রান্তর	মাসিক 'বালিগঞ্জ'	১৯৪০
বনস্পতি	'ক্রান্তি' সংকলন-গ্রন্থ	১৯৪০

উপর্যুক্ত গল্পগুলো ছাড়াও, 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ' গ্রন্থের সম্পাদক দিলীপ মজুমদার বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা-সাময়িকী থেকে তাঁর

*চিহ্নিত গল্পগুলো সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

আরো ৭টি গল্প উদ্ধার করেছেন। গল্পগুলোর নাম ও প্রকাশ-উৎস দেয়া হলো :[৭৪]

১. শিশু তপন, সাপ্তাহিক 'দেশ', কলকাতা, ১৯৩৭
২. পথবর্তী, মাসিক 'শান্তি', ঢাকা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
৩. মুহূর্ত, সাপ্তাহিক 'অরণি' (সম্পাদক : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার), কলকাতা, জুলাই ১৯৪২
৪. রাণু ও স্যর বিজয়শঙ্কর, সাপ্তাহিক 'সবুজ বাংলার কথা' (সম্পাদক : নির্মলচন্দ্র ঘোষ), কলকাতা, কার্তিক ১৩৪৫
৫. এক্স গোলজার, সাপ্তাহিক 'সবুজ বাংলার কথা', কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
৬. অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন, মাসিক 'অগ্রগতি' (সম্পাদক : নির্মলচন্দ্র ঘোষ), কলকাতা, ১৯৩৮
৭. মরুভূমিতে মুক্তি, (জানা যায়নি)।

এ-ছাড়া তাঁর আরো দুটো গল্পের নাম ও প্রকাশকাল জানা গেছে, কিন্তু পত্রিকা না-পাবার জন্যে গল্পদুটো এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গল্প দুটো হচ্ছে :

১. দুই পরিচ্ছেদ, পত্রিকার নাম জানা যায়নি, ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত।
২. মুখোস, সাপ্তাহিক 'নবশক্তি', ১৯৩৮।

সোমেন চন্দের অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো এখন কালের গর্ভে। ১৩৪৬ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'শান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রাজপথ' শীর্ষক একটি মাত্র কবিতা এখন সোমেন চন্দের কবি-সত্তার পরিচয়বাহী। 'বিপ্লব' এবং 'প্রস্তাবনা' নামে সোমেন চন্দের দুটি একাংকিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশ উৎস :

১. বিপ্লব, মাসিক 'শান্তি', ঢাকা, বৈশাখ ১৩৪৭
২. প্রস্তাবনা, মাসিক 'শান্তি', ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৪৭

কলিকাতার সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকার ১৯৩৮-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সোমেন চন্দের প্রথম উপন্যাস। 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক

ছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৩৬৩) উপন্যাসের জনয়িতা অদ্বৈত মল্লবর্মন। অদ্বৈত মল্লবর্মন তরুণ সোমেনের সাহিত্য-সম্ভাবনাকে নির্ভুলভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি 'নবশক্তি'-তে ছেপেছিলেন উপন্যাসটি। কিন্তু সাময়িকীর পাতা থেকে পরবর্তীকালে উপন্যাসটি আর উদ্ধার করা যায়নি, এমন কি জানা যায়নি তার নাম—এখন সে সাময়িকী দুর্লভ।[৭৫]

এ-যাবৎ পাওয়া সোমেন চন্দের একমাত্র উপন্যাস 'বন্যা' (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হয় নির্মলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত কলকাতার 'বালিগঞ্জ' পত্রিকায়। মাঘ ১৩৪৬ থেকে মাঘ ১৩৪৭—এই এক বছরে প্রকাশিত উক্ত পত্রিকার মোট ১১টি সংখ্যায় 'বন্যা' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। এ-সময় সোমেন চন্দ 'বন্যা'র দ্বিতীয় খণ্ড লেখাও শেষ করেন। নির্মলচন্দ্র ঘোষের কাছে ১৯৩৮ সালের ৯ই নভেম্বরে লেখা সোমেনের এক চিঠিতে এ-প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে।[৭৬] কিন্তু 'বন্যা'-র দ্বিতীয় খণ্ড কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এ-প্রসঙ্গে সোমেন চন্দের রচনাসংগ্রহের সম্পাদক দিলীপ মজুমদার লিখেছেন :

> "বালিগঞ্জ" পত্রিকায় 'বন্যা' উপন্যাস প্রকাশিত হবার সময় সোমেন উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব লেখাও শেষ করেন। দুই-তিনটি খাতায় লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি তিনি নির্মলবাবুর নিকট পাঠিয়েছিলেন। নির্মলবাবু মালতীকে নায়িকা করে রচনাগুলি নূতন করে লেখার অনুরোধ জানিয়ে খাতাগুলো ফেরত দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে "বালিগঞ্জ" পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার কিছুদিন পরে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ সোমেন নিহত হন। 'বন্যা'র ২য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিগুলির হদিশ আর পাওয়া যায়নি।[৭৭]

সোমেন চন্দের কিছু গল্প বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে তাঁর 'ইঁদুর' গল্পের কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। মৃত্যুর পর 'পরিচয়' পত্রিকায় 'ইঁদুর' গল্প প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অশোক মিত্র *Mice* নাম দিয়ে 'ইঁদুর' গল্প অনুবাদ করলে সোমেন চন্দ সাহিত্যিক হিসেবে ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করেন।[৭৮] শ্রীমতি লীলা রায় তাঁর 'সংকেত' গল্পটিকে *Sign* নাম দিয়ে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৭৯]

শত ব্যস্ততার মধ্যেও All India Radio-র ঢাকা কেন্দ্রের শিক্ষা-মূলক অনুষ্ঠানে সোমেন চন্দ ছিলেন একজন প্রায়-নিয়মিত আলোচক। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন, কখনো করতেন গ্রন্থের সমালোচনা। আমাদের কাছে আছে এমন একটি মূল চুক্তিপত্র, যেখানে দেখা যাচ্ছে সোমেন চন্দ ১৯৪০ সালের ২৫শে জুন সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ২০ মিনিটের একটি কথিকায় 'মৌমাছির জীবনকথা' বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এ-পর্বের প্রতিটি কথিকার জন্য তখন ১০ টাকা করে তিনি পারিশ্রমিক পেতেন।

সোমেন চন্দ ছিলেন উদার, বন্ধু-বৎসল, নিরহঙ্কারী শান্ত-স্বভাবের মানুষ। তিনি অতি অল্প-বয়সেই ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন—সাহিত্য ও রাজনীতি-অঙ্গনে; তবু তাঁর মধ্যে ছিলনা 'প্রতিভাবানের উন্নাসিকতা'। অতি বিনয়ী সোমেন ছিলেন আত্মপ্রচার-বিমুখ। নিজের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখার কথা তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছেও কখনো বলতেননা। সোমেন চন্দের বন্ধু-বাৎসল্য ছিল সুগভীর। ট্রেড ইউনিয়ন এবং প্রগতি লেখক সংঘের মূল দায়িত্ব পালন করার মাঝেও বিপদগ্রস্ত বা অসুস্থ বন্ধুর সাহায্য-সহযোগিতায় তিনি আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতেন—এ-ছিল তাঁর চরিত্রের এক দুর্লভ গুণ। এ-প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা অনিল মুখার্জীর স্মৃতির লেখন এ-রকম :

> একদিন রাত্রিতে অচ্যুত গোঁসাইর বাসায় যাই কি একটা কাজে। পাঁচড়াতে অচ্যুতবাবু নড়াচড়া করিতে পারেন না, তার উপর খুব হাপানীর প্রকোপ ও জ্বর। অচ্যুতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার খোঁজ-খবর করেন কে। তিনি বলিলেন, "প্রত্যহই সোমেন আসে এবং বার্লি ও তরকারী তৈয়ার করিয়া দেয়। বন্ধু-বান্ধব আর কাহারও বড় সান্নিধ্য মিলে না, কিন্তু সোমেনের কামাই নাই। যত কাজই থাকুক দুইবার আসিবেই। তবে সময়টা ঠিক রাখিতে পারেনা, রেলওয়ে ইউনিয়নের কাজে খুব ব্যস্ত।" কথা শেষ হইতেই সোমেন আসিয়া হাজির, হাতে একটা বাটি—বাসা হইতে তরকারী তৈয়ার করিয়া আনিয়াছে।[৪০]

সোমেন চন্দ শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন বলে তাঁর শত্রু ছিলনা বললেই চলে। তবু রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে তাঁকে অকালে নিহত হতে হয়েছে। যে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে হত্যা করেছে, তারাও পরবর্তী-কালে এমন একজন শান্ত-উদার-কর্মিষ্ঠ মানুষকে হত্যার জন্যে দগ্ধ হয়েছে অনুশোচনায়। সতীশ পাকড়াশী লিখছেন, "সোমেনের শান্ত অমায়িক স্বভাব সকলকে আকৃষ্ট করেছিল—কারুর সঙ্গে তার শত্রুতা ছিলনা। ঘটনার কয়েক মাস পরে শান্তভাবে আলাপ করতে করতে ফ্যাসিস্ট দলের এক সরল যুবক অসতর্ক মুহূর্তে আমাকে বলেছিল, সোমেন বাবুকে মারা ঠিক হয়নি, তার প্রতি আমাদের কোনো আক্রোশ ছিলনা বরং তার শান্ত স্বভাবের জন্য আমরা তাকে ভালোই মনে করতাম।"[৮১]

অচ্যুত গোস্বামীর কাছে ১৭-০৮-১৯৪০ তারিখে লেখা সোমেনের একটা চিঠি থেকেও আমরা তাঁর বন্ধু-প্রীতির কথা জানতে পারি। ঐ পত্রে, যেন বিজ্ঞ অভিভাবক সোমেন, অচ্যুত গোস্বামীকে চলতে বলেছিলেন এভাবে :[৮২]

> অবশেষে আপনার প্রতি আমি কয়েকটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি :
>
> ১. রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যখন-তখন যা-তা খাবেন না।
> ২. রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া দেখে চলবেন।
> ৩. ···অথবা ঐ-জাতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বেশীক্ষণ কাটাবেন না।

সমসাময়িক কালে ঢাকা শহরে প্রয়োজনীয় বই পাওয়া যেতনা ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই ছিল সামপ্রতিক বইয়ের একমাত্র সংগ্রহ। সোমেন অনেক সময়েই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পড়তে আসতেন, কখনো কখনো বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির কাছ থেকেও বই নিয়ে তিনি পড়তেন। পৃথিবীকে জানার স্পৃহা ছিল তাঁর অদম্য। তাই ১৯৩৮ সালের মধ্যে, সোমেনের বয়স যখন মাত্র আঠার, তিনি টি. এস. এলিয়ট, অডেন, স্টিফেন স্পেন্ডার, ভার্জিনিয়া উলফ্, অডজুস হাক্সলী, ই. এম. ফর্স্টার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ম্যাক্সিম গোর্কি, মিখাইল শলোকভ, রেমার্কে, ইগনোৎসিও সিলোনি, লডভিগ রেনে, আঁদে জিদ, টমাস মান, র‍্যালফ ফক্স্, ক্রিস্টোফার কডওয়েল,

আপটন সিনক্লেয়ার, পার্ল এস. বাক প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন। কিশোর বয়স থেকেই এ-সব লেখকের বিভিন্ন উক্তি তিনি নোট বইয়ে টুকে রাখতেন। নিজের লেখক-জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্যেও এ-সব লেখকের রচনাবলির সঙ্গে গভীর পরিচয়কে অত্যাবশ্যক বলে তিনি মনে করতেন।

অল্প বয়স থেকেই তিনি দুই ধরনের বই পড়তে শুরু করেন—রাজনীতি আর সাহিত্যের। তাঁর পড়ালেখার পরিধি ছিল বিস্তৃত এবং ব্যাপক। মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' যেমন তিনি গভীরভাবে পড়েছেন, তেমনি আবার জোফেস ম্যাজিনির *Duties of Man*, রম্যাঁ রলাঁ-র *I will not rest*, র‍্যালফ ফক্সের *The Novel and the People* কিংবা ক্রিস্টোফার কডওয়েলের *Illusion and Reality* ছিল তাঁর অতি প্রিয় বই। তাঁর গল্পের কোন কোন চরিত্র, বলাইবাহুল্য এরা সোমেনের আত্মজৈবনিক, গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছে গোর্কি, রলাঁ কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স কিংবা রোমনভ। তত্ত্বগত জ্ঞানের ভিত সুদৃঢ় করার জন্যে সোমেন বিশুদ্ধ সাহিত্যের পাশাপাশি **Anthropology, Economics, Political Science, Philosophy of Religion**—প্রভৃতি বিষয়েও বিস্তৃত পড়ালেখা করতেন। প্রচুর পড়ালেখা করলেও, এ-ব্যাপারে তাঁর কোন অহমিকা কিংবা উন্নাসিকতা ছিলনা, বরং প্রায়শই তিনি বিনয়ের সঙ্গে বলতেন, 'আমার পড়ালেখা হচ্ছেনা, আরো পড়তে হবে।' এ-প্রসঙ্গে সমীন্দ্রকুমার হোরের স্মৃতির লেখন উদ্ধৃত করছি :

> আমার পাশে একটা টেবিলের ওপর একখানা Penguin Series-এর বই পড়েছিল—দেখলাম *The Floating Republic*. আমি বললাম—'সোমেন তুমি নিশ্চয়ই ভীষণ পড়াশুনা কর, না?' এই বার সোমেনের মুখের হাসি গেছে। 'কোথায় আর পড়া হয় বলুন? বিদ্যে তো ম্যাট্রিক—ভাল ভাল ইংরেজী বই পড়ে ভাল বুঝিনা। ইস্, কি বলবো কমরেড, যদি ইংরেজী ভাষাটা জানতাম?' ও বলে যাচ্ছিল। ওর মুখের দিকে খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ একটা অনুশোচনার ছাপ। আমি বললাম, 'এর কোন মানে হয়না। তুমি তো ইংরেজী জানো তবুও। অনেকে যে আছে একদম জানেনা।' সোমেন বলল—কোথায়, এই দেখুন না,

Caudwell-এর *Illusion and Reality*-খানা পড়ে ভাল বুঝতে পারলাম না—এর কোন মানে হয়।'৮৩

সোমেন চন্দ খাঁটি তাত্ত্বিকের মতো কেবল রাজনীতিকেই ভালোবাসতেন না—তিনি রাজনীতি এবং শিল্পকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছিলেন বিস্ময়কর সাফল্য ও সিদ্ধির স্বাক্ষর রেখে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, সাহিত্য ক্ষেত্রেও। তবে কখনো কখনো, বিশেষত প্রথম দিকের গল্পে তাঁকে রোম্যান্টিক হিসেবে চিনে নিতে তেমন কষ্ট হয়না। এ-পর্বে রোম্যান্টিক দৃষ্টি দিয়ে তিনি প্রকৃতিকেও ভালোবেসেছিলেন। নির্মলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিতে আছে সোমেনের প্রকৃতি-প্রীতির সংবাদ :

'আপনি যে লিখেছিলেন আপনার বাড়ীর সামনে কৃষ্ণচূড়ার শিখরে লাল ফুলের সমারোহ, তারা কোথায়?'—সোমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করছিল।

আমি বলেছিলাম, 'সম্প্রতি সেটা কাটা গেছে, আর সে জায়গায় উঠেছে ঐ চারতলা বাড়ীটা।'

—'না কাটলেও কি মানুষের বাস করবার স্থানাভাব হোতো কলকাতায়?'৮৪

সোমেন চন্দ তাঁর বিস্ময়কর এবং কাললগ্ন প্রতিভা-গুণে প্রগতিশীল সমাজ আর সাহিত্যান্দোলনে নিজেকে স্বতন্ত্র এবং ব্যতিক্রমী সত্তা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিলেন। তাঁর সকল কর্মের পিছনেই একমাত্র স্বপ্ন ছিল শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের বিজয়-সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা; নিপীড়িত মানুষের আপোষহীন সংগ্রামের শিল্পরূপ-সৃজনই তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের মৌল অন্বিষ্ট। সৃজনলগ্নের ভোরবেলা থেকেই তিনি গেয়েছেন মানুষের মুক্তির গান, স্বাধীনতার গান, শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার কোরাস। এই আপোষহীন বিপ্লবীর রক্ত মিশেছে পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সাথে। বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্যিক-শহীদ এই বীর কমিউনিস্ট লেখক প্রতিটি আগামীর যুদ্ধে এক মহান মুক্তিযোদ্ধার সাহস-সংকল্প আর অন্তহীন প্রেরণা নিয়ে থাকবেন আমাদের সাথে, জনতার মাঝে।

তথ্যসঙ্কেত

১ সোমেন চন্দের মূল নাম সোমেন্দ্রকুমার চন্দ। প্রথম দিকে কোন কোন লেখায় লেখক হিসেবে তাঁর পূর্ণ নামই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে, সাহিত্য ও রাজনীতি-অঙ্গনে, তিনি সোমেন চন্দ নামেই সমধিক পরিচিত।

২ সোমেনের ছোট ভাইয়ের নাম কল্যাণকুমার চন্দ। তিনি বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন।

৩ সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ (সম্পাদক: দিলীপ মজুমদার), ২য় খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৭ (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট-১, সোমেন চন্দ: স্মৃতিকথা, আলোচনা), পৃ. ১৭৬

৪ দ্রষ্টব্য: সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ (সম্পাদক: দিলীপ মজুমদার), ১ম খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ. ২৭৯। এরপর থেকে কেবল রচনাসংগ্রহ-১ কিংবা রচনাসংগ্রহ-২ উল্লেখিত হবে।

৫ দ্রষ্টব্য: রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৭৯

৬ অচ্যুত গোস্বামী: "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", 'এষা', ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭৬। উদ্ধৃত: রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮২

৭ দ্রষ্টব্য: রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৭৮

৮ সোমেনের বন্ধু এবং মেসো কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে সোমেনের এই সঙ্গীতপ্রীতির কথা জানিয়েছেন।

৯ এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী 'অগ্নিযুগের কথা' গ্রন্থের লেখক সতীশ পাকড়াশীর স্মৃতি স্মরণীয়:

> "ঢাকা শহরে ছোটবড় অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের তথাকথিত রাজনীতিক বিপ্লব-সঙ্ঘ আছে। এরা (সোমেন ও তাঁর বন্ধুরা) কোন দলে যায়নি। সোমেন একদিন বলে: দলের টানাটানি আমাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যাইনি—কেবল মারামারি রেশারেশি তাদের কাজ—আমার ভালো লাগেনা।"

—দ্রষ্টব্য: সতীশ পাকড়াশী: অগ্নিযুগের কথা, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭৮, পরিশিষ্ট—'সোমেন চন্দ', পৃ. ২৫৫

১০ জ্ঞান চক্রবর্তী: "সোমেন চন্দ", 'গণসাহিত্য', (সম্পাদক: আবুল হাসনাত, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মফিদুল হক), প্রথম বর্ষ, ৮ম-৯ম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল—১৯৭৩, পৃ. ৫৬

১১ 'অগ্নিযুগের কথা' (১৩৭৮) গ্রন্থের লেখক সতীশ পাকড়াশী (১৮৯৬–১৯৭৩) ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা-সংগ্রামী। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদী পথ পরিহার করে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন-সৃষ্টিতে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁর স্মৃতিকথা 'অগ্নিযুগের কথা'য় আছে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

১২ সোমেন চন্দের সঙ্গে সতীশ পাকড়াশীর প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

"আন্দামান ফেরতা, টেররিস্ট বিপ্লবী দলের পুরানো কর্মী বলে সে প্রথমটায় আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিনের পরিচয়েই আমি তাকে বলি,—সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখী-জনগণের আশা-উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণসাহিত্য তৈরী কর—তাহলে তোমার ইপ্সিত স্বাভাবিক কর্মপথেই ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক হতে পারো। লেখার দিকেই তার বেশী টান এইটে বুঝেই ঐ কথা বলেছিলাম।"

—দ্রষ্টব্য : সতীশ পাকড়াশী : অগ্নিযুগের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

১৩ সতীশ পাকড়াশী ; অগ্নিযুগের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

১৪ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ঢাকা জেলা কমিটিতে তখন ছিলেন এই সব কমিউনিস্ট নেতা—জ্ঞান চক্রবর্তী, নেপাল নাগ, নিরঞ্জন গুপ্ত, অনিল মুখার্জি, ফণী গুহ, প্রবোধ গুপ্ত এবং বেণু ধর। এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন জ্ঞান চক্রবর্তী।

—দ্রষ্টব্য : খোকা রায় : সংগ্রামের তিন দশক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৬–১৭

১৫ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৪০–৪১

১৬ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", পূর্বোক্ত, রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮৩

১৭ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", পূর্বোক্ত, রচনা সংগ্রহ-১, পৃ. ২৮৩

১৮ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৭৬

১৯ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩–৮৪

২০ শ্রমিকদের মধ্যে সোমেন চন্দের কর্ম-তৎপরতার এক উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন অচ্যুত গোস্বামী :

'তিন-চারজন শ্রমিকের সঙ্গে ছেলেটি (সোমেন চন্দ) কথা বলছিল। ইতিমধ্যে আরও তিন চারজন শ্রমিককে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে ডাকল : আপনারা শুনুন। ওরা কাছে যেতেই জিজ্ঞেস করল : আপনি ইউনিয়নের সভ্য হয়েছেন? আপনি ?···

একজন শুধু মাথা নাড়ল। একজন বলল সে গতবছর সভ্য ছিল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল সে ইউনিয়ন-ফিউনিয়নের খবর রাখেনা। ছেলেটি ওদের ধমকের স্বরে বলতে লাগল : আপনারা মনে করেছেন কি ? ইউনিয়নকে শক্তিশালী না করে আপনারা বাঁচতে পারবেন ? আপনারা একা একা পারবেন মালিকের সঙ্গে বুঝতে ? ম্যানেজার শুনবে আপনাদের কথা ? ওরা মেরে মেরে তো গায়ের রঙ ফ্যাকাশে করে দিয়েছে, তবু চৈতন্য হচ্ছেনা ? বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক জমে গেল। সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন হবে। ছেলেটিকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, আমি বাইর থেকে তাকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। মিনিট পাঁচ-সাত পর শ্রমিকের দল কারখানার দিকে চলে গেল।''

—দ্রষ্টব্য : অচ্যুত গোস্বামী : 'সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য,' পূর্বোক্ত, রচনাসংগ্রহ-১; পৃ. ২৮২

২১ জ্ঞান চক্রবর্তী : 'সোমেন চন্দ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

২২ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮১

২৩ দ্রষ্টব্য : জ্ঞান চক্রবর্তী : ''সোমেন চন্দ'', সাপ্তাহিক 'একতা,' ঢাকা, ১০ই মার্চ ১৯৭৩। আরও দেখুন : রচনাসংগ্রহ-১ পৃ. ২৯৬

২৪ ''২২-এ জুন ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ভূমি আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক জন-সভা থেকে গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। সভাপতি : ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক : স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র, জ্যোতি বসু প্রমুখ এই সুহৃদ সমিতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।''

—দ্রষ্টব্য : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) : প্রতিরোধ প্রতি-দিন, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৬৭

২৫ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগৃহ-১, পৃ. ৩৬৬

২৬ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : "চল্লিশ দশকের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন : পূর্ববঙ্গ," প্রতিরোধ প্রতিদিন (সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত), পৃ. ২০৫-০৬

২৭ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৪১

২৮ এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়—সোমেন চন্দের 'একটি রাত' গল্পের নায়ক সুকুমারকে। সুকুমার নিজের মধ্যে দেখেছে ম্যাক্সিম গোর্কির পাভেলের প্রতিকৃতি আর নিজের মাকে ভেবেছে পেলগায় নিলভানা ভ্লাসভা। গল্পের সেই এলাকা :

"মা তার দিকে একদৃষ্টে চাইলো, এই মধুর স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় মুখের কাঠিন্য চেষ্টা করলো দূর করতে, কিন্তু চেষ্টা করেও যেন পারলো না।

সুকুমার বললে, 'বুঝবে না! আপনারা পাভেলকে জানেন ?'

—'পাভেল ?'

—'সে কী, গোর্কির 'মা' পড়েন নি ?'

—'হুঁ, পড়েছি, পড়েছি।'

—'ইনিও সেই পাভেলের মা, সেই মা!' সুকুমার মা'র দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।"

—কেবল গোর্কিই নয়, সোমেনের নায়ক সুকুমার র‍্যালফ ফক্স-এর বই পড়তেও ভালোবাসে। তাই—"এদিকে কিছুক্ষণ পরেই আবার সুকুমার ঘুম থেকে উঠে বসলো, কিছুক্ষণ অর্ধনিমীলিত চোখে চেয়ে বসে তারপর আলো জ্বালিয়ে একটা বই খুলে বসলো। বইখানা র‍্যালফ্ ফক্স-এর 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি'।"

—দ্রষ্টব্য : সোমেন চন্দ : "একটি রাত", রচনাসংগৃহ-১, পৃ. ১৭৩ এবং ১৭৭

২৯ 'প্রগতি লেখক সংঘে'-এর খসড়া ইশতেহারের মূল কথা ছিল :

"আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করেছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা, এই আমাদের কর্তব্য। ···আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধি কলার নিবিড় সংযোগ ; আমরা চাই যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।···ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবি করি।···যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ

করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতি-নীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃংখলাপটু ও সমাজের রূপান্তর করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২ পৃ. ২৫১

৩০ উদ্ধৃত : নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (চতুর্থ খণ্ড), চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৮৯

৩১ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৬৩-৬৪

৩২ জ্ঞান চক্রবর্তী : "সোমেন চন্দ", সাপ্তাহিক 'একতা', পূর্বোক্ত।

৩৩ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", পূর্বোক্ত, রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮৬

৩৪ দ্রষ্টব্য : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : "সোমেন চন্দ ও সমকাল", 'সাহিত্য-চিন্তা' (সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত), ১০ম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা (সোমেন চন্দ স্মরণ সংখ্যা), কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮১, পৃ. ৩৩

৩৫ রণেশ দাশগুপ্ত (সম্পাদক) : সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩, দ্র. ভূমিকাংশ, পৃ. ।/.-।৶.

৩৬ সতীশ পাকড়াশী : অগ্নিযুগের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯

৩৭ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮৬

৩৮ এ-প্রসঙ্গে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের স্মৃতি :

"১৯৩৯ সনে কলকাতা থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘের' উদ্যোগে 'প্রগতি' নামের সংকলনগ্রন্থ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। রণেশবাবু প্রস্তাব করলেন ঐ ধরনের একটি সংকলন যেন আমরা ঢাকা থেকে প্রকাশ করি। আরো স্থির হল যে ঢাকা জেলা 'প্রগতি লেখক সংঘের' লেখকরাই শুধু ঐ সংকলনে লিখবেন।"

—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৬৩

৩৯ 'সন্তান' এখানে 'ক্রান্তি' সংকলন-গ্রন্থের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। গোপনীয়তা রক্ষার জন্যেই সোমেনের এই সতর্কতা।

৪০ অচ্যুত গোস্বামীকে লেখা সোমেন চন্দের চিঠি। দ্রষ্টব্য : রচনা-সংগ্রহ-১, পৃ. ৩০৫

৪১ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : "প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও সোমেন চন্দ", 'নতুন পরিবেশ', কলকাতা, জুলাই-সেপ্টেম্বর—১৯৭৩। উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ—১, পৃ. ৩৬৪

৪২ "ইঁদুর" 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তখন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং হিরণকুমার সান্যাল।

৪৩ নির্মলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিকথা, দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৭৪

৪৪ নির্মলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিকথা, দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৭৫

৪৫ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", পূর্বোক্ত, রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮৭-৮৮

৪৬ দ্রষ্টব্য : 'প্রতিরোধ', ঢাকা, ১লা আষাঢ় ১৩৪৯, পৃ. ৯। উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ২২৯

৪৭ সতীন্দ্রকুমার হোর : "সোমেন চন্দ", 'প্রতিরোধ', ঢাকা, ১৩৫০, সোমেন স্মৃতি সংখ্যা। উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮০-৮১

৪৮ অচ্যুত গোস্বামী : "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", পূর্বোক্ত, রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৯১

৪৯ সোমেন চন্দ গল্প এবং কবিতাই লিখেছেন বেশী। উপন্যাস এবং নাটিকাও তিনি রচনা করেছেন। সতীশ পাকড়াশী জানাচ্ছেন যে, তিনি প্রবন্ধও লিখতেন এবং তা ঢাকার পত্র-পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে (দ্রষ্টব্য : সতীশ পাকড়াশী : অগ্নিযুগের কথা, পূর্বোক্ত পৃ. ২৫৭)। কালের সীমানা পেরিয়ে তাঁর গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটিকা আমাদের হাতে এসে পৌঁছলেও, আজও তাঁর কোন প্রবন্ধ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৫০ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৭৩

৫১ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ২০৫

৫২ জ্ঞান চক্রবর্তী : "সোমেন চন্দ:", 'একতা', ঢাকা, ১০ই মার্চ, ১৯৭৩। আরও দেখুন :

জ্ঞান চক্রবর্তী : ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, জন সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ।

৫৩ 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ' গ্রন্থের সম্পাদক দিলীপ মজুমদার 'প্রতিরোধ' (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) পত্রিকায় প্রকাশিত "২৪ শে

ফাল্গুন" প্রবন্ধের লেখক "প্রত্যক্ষদর্শী"কে সরলানন্দ সেন বলে সংশয়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৪৩

৫৪ দ্রষ্টব্য : 'প্রত্যক্ষদর্শী'র লেখা "২৪শে ফাল্গুন" প্রবন্ধ; 'প্রতিরোধ' ঢাকা, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯। উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৪৫-৪৬

৫৫ ক. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

"শ্রমিককর্মী সোমেন চন্দ'''আন্তরিকভাবে ফ্যাসিবাদবিরোধী জনযুদ্ধে যোগদানের সমর্থক বলিয়া পরিচিত।'''ফ্যাসিস্ট জাপানের সম্ভাব্য আক্রমণে যখন ভারতবর্ষ এবং ভারতের জনসাধারণ বিপদাপন্ন, তখন জাপানের বিরুদ্ধে সর্বস্বপন করিয়া যোগদান করিতে তৎপর ফ্যাসিস্টবিরোধীদের সম্মেলন যাহারা পণ্ড করিতে সচেষ্ট এবং ফ্যাসিস্টবিরোধী জনসৈনিককে খুন করিতে প্রস্তুত তাহারা যে পরোক্ষে জাপানের গুপ্তচরের ভূমিকায়ই অভিনয় করে তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।"

—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৫২-৫৩

খ. ১৩৪৯ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

"'''সোমেন মার্কসবাদী ছিল। এই মার্কসবাদের প্রেরণাতেই সে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নির্ভীক ভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রাণ দিতে হল এই বর্বরতার যূপকাষ্ঠে। সব থেকে শোচনীয় ব্যাপার এই যে সোমেনকে যারা হত্যা করেছে তারা জার্মান, ইতালীয় বা জাপানী নয়, তারা আমাদেরই দেশের লোক। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার প্রভাব কী রকম ব্যাপক ও তার বিরুদ্ধে আমাদের কতখানি সতর্ক হওয়ার দরকার আছে এই ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।"

—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৫৩

গ. বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার (আষাঢ় ১৩৪৯) সম্পাদকীয়তে লেখেন :

'ঢাকায় তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দর হত্যার সংবাদে বাংলার মনীষী মহলে যে উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে তা একান্তই সঙ্গত। '''ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘ থেকে প্রচারিত "ক্রান্তি" বইটিতে তাঁর রচনায় সাহিত্যের স্বাদ ছিল এবং তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণতায় মঞ্জুরিত হতে পারলে নানা দিক দিয়েই তিনি তাঁর সমসাময়িক জীবনে আপন স্বাক্ষর এঁকে দিতে পারতেন।

—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৮১

৫৬ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৫৪-৫৫

৫৭ দিলীপ মজুমদার, রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৬৭

৫৮ ধনঞ্জয় দাশ : মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম খণ্ড), ভূমিকাংশ, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৬।

৫৯ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৬৫-৬৬

৬০ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৭৫

৬১ 'প্রাচীর' সংকলনের সম্পাদক ছিলেন মিহির বসু ও অজয় দাশ-গুপ্ত। সংকলনটি 'দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেডারেশন' (কার্যালয় : ৫ এ ইন্দ্ররায় রোড) প্রকাশ করে। দ্রষ্টব্য : সুভাষ মুখোপাধ্যায় : "একটি বুলেট, একটি ফ্যাসিস্ট", প্রতিরোধ প্রতিদিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮

৬২ উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৭৮

৬৩ বুদ্ধদেব বসু : "প্রতিবাদ", উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ২২৯-৩০

৬৪ দ্রষ্টব্য : প্রতিরোধ প্রতিদিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৬৫ দ্রষ্টব্য : সেলিনা হোসেন : নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, একুশের উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৯১-২৯৮

৬৬ 'প্রতিরোধ' পত্রিকা প্রকাশের মূল লক্ষ্য ছিল সোমেন চন্দের আদর্শ তরুণ-সমাজের কাছে পৌঁছে দেয়া।

৬৭ আবদুর রাজ্জাক : "মাটির কাছাকাছি", দৈনিক 'সংবাদ', ঢাকা, শুক্রবার, ১০ই কার্তিক ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ। আরও দেখুন : রচনা-সংগ্রহ-১, পৃ. ৩৫৯

৬৮ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৭৭-৭৮

৬৯ দ্রষ্টব্য :

ক. জ্ঞান চক্রবর্তী : ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, জন সাহিত্য প্রকাশন, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ ১৯৭২, পৃ. চুয়াল্লিশ-ছেচল্লিশ।

খ. মণি সিংহ : জীবন সংগ্রাম, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৫৩-৫৫

গ. খোকা রায় : সংগ্রামের তিন দশক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৮-৩৯

৭০ ক. সরোজমোহন মিত্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃ. ৬৪

খ. সাঈদ-উর-রহমান : পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৪-২৫

৭১ সরদার ফজলুল করিম : সমাজ নিরীক্ষণ বক্তৃতা—১৯৮৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৬-১৮

৭২ সরদার ফজলুল করিম : "আমার বন্ধু", সংবাদ, ঢাকা, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৮২।

৭৩ 'অমিল' নামে সোমেন চন্দের দুটো গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় 'সাহিত্যচিন্তা' (সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত) পত্রিকার (এপ্রিল মে ১৯৮১) ৭৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'সোমেন চন্দের রচনাপঞ্জী'তে। আসলে একটি গল্পই দু'জায়গায় প্রকাশিত হয় 'অমিল' নির্মলকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'সবুজ বাংলার কথা'য় ১৯৩৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 'অমিল'ই সোমেনের মৃত্যুর পর ঢাকার পাক্ষিক প্রতিরোধ পত্রিকায় ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়।

৭৪ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩১০

৭৫ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : "সোমেন চন্দ ও সমকাল", 'সাহিত্যচিন্তা' (সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত), কলিকাতা, ১০ম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮১, পৃ. ৩৩-৩৪

৭৬ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩০২-০৫

৭৭ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ২০৭

৭৮ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৩৬-৫৩

৭৯ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৫৪-৬৯

৮০ অনিল মুখার্জী : "সোমেন চন্দ", 'প্রতিরোধ', ১৩৫০, সোমেন স্মৃতি সংখ্যা। উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৭৬-৭৭

৮১ সতীশ পাকড়াশী : অগ্নিযুগের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

৮২ দ্রষ্টব্য : অচ্যুত গোস্বামীর কাছে লেখা সোমেনের ১৭-০৮-১৯৪০ তারিখের চিঠি। উদ্ধৃত : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩০৫

৮৩ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮১

৮৪ দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৭৫